গল্পে-জল্পে জেনেটিক্স

প্রথম খণ্ড

চমন হাসান

উৎসর্গ:

'প্রজনন'কে, যাকে ছাড়া এ বইটি, বইটি যারা লিখেছেন কিংবা বইটি যারা পড়বেন কারও অস্তিত্বই সম্ভব ছিল না!

চমক হাসান

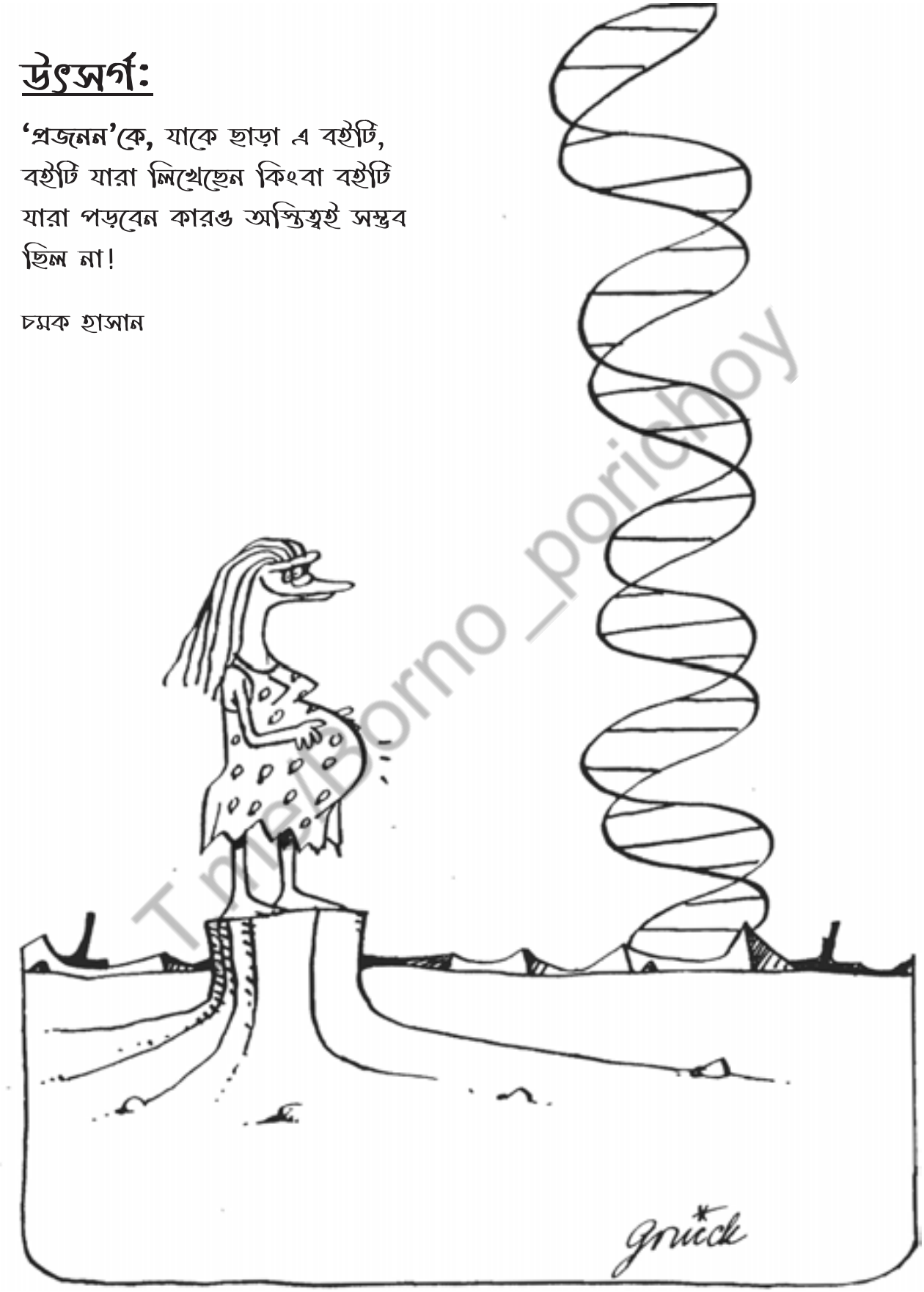

T.me/Borno_porichoy

উৎসর্গ

মেডিকেল পড়ুয়া সেই সকল সৌভাগ্যবান/সৌভাগ্যবতী যোদ্ধাদের - যারা ব্রেন এর ধূসর কোষগুলো সতেজ রাখার পাশাপাশি ভালো লাগার জন্যে ও পড়েন

তন্ময়

T.me/Borno_porichoy

Join Our Telegram Channel
T.me/Borno_porichoy

মুখবন্ধ

'গল্পে-জল্পে জেনেটিক্স' বইটির সম্পর্কে লেখার আগে বইয়ের পটভূমিটাও একটু জানানো দরকার। বইটি লেখার ক্ষেত্রে বিদেশি ভাষায় লেখা 'এ কার্টুন গাইড টু জেনেটিক্স' বইটি থেকে সমুদয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

কার্টুন গাইড টু জেনেটিক্স-এর মূল বইটি আমার হাতে আসে যখন, তখন আমি মেডিকেলের পঞ্চম বর্ষের ছাত্র। সুব্রত ভাই প্রথম বইটির কথা আমাকে বলেছিলেন। আর চমকের (ইনিই হলেন আমাদের লেখক সাহেব) কাছ থেকে বইটির সফট কপি পাই। সুব্রত ভাই আর চমক দুজনেই ইঞ্জিনিয়ার মানুষ আর আমি হলাম গোবেচারা ডাক্তার। গণিত অলিম্পিয়াড নামক অসামান্য চমৎকার ব্যাপারটি বাংলাদেশে না ঘটলে আমরা হয়তো কেউ কাউকে কখনোই চিনতে পারতাম না! সে যা-ই হোক, বইটি হাতে পেয়ে এবং সেই সঙ্গে তাদের কাছে বইটির উচ্ছকিত প্রশংসা শুনে, পড়ার আগে আমি ধারণা করেছিলাম, বইটি বোধ হয় একেবারে মন্দ নয়। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কারণেই হোক কিংবা যে কারণেই হোক, অনেক ডাক্তারই ভাবেন যে ডাক্তারিবিদ্যা এবং তৎসংশ্লিষ্ট জ্ঞান (তার মধ্যে জেনেটিক্সও পড়ে) হজম করা ইঞ্জিনিয়ারদের কম্মো নয়। অনেক ইঞ্জিনিয়ারও ডাক্তারদের সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা পোষণ করেন। তো, আমিও প্রথমটাই ভেবেছিলাম। সত্যটা বলেই ফেলি, এ বইটিতে জেনেটিক্সের নিছক প্রাথমিক কিছু ধারণা অত্যন্ত সরল ভাষায় বাচ্চাদের (এবং ইঞ্জিনিয়ারদের) বোঝার মতো করে তুলে ধরা হয়েছে। বইটি পড়ে আমি নতুন কিছু শিখব তা আশা করে বইটি পড়া শুরু করিনি; বরং যারা জেনেটিক্সের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েনি, তাদের কী ভাষায় বললে সহজে জেনেটিক্স বোঝানো যাবে সেটা জানতেই বইটা পড়া শুরু করি। কেননা, ডাক্তার হিসেবে প্রায়ই অসুখ-বিসুখ নিয়ে রোগী বা রোগীর স্বজনকে বুঝিয়ে বলা লাগে এবং তখন জেনেটিক্স-সংক্রান্ত অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়।

কিন্তু বইটা পড়া যতই এগোতে থাকে ততই আমি বিস্মিত হতে থাকি। এ কী! এ তো দেখছি মেডিকেল প্রথম বর্ষের বায়োকেমিস্ট্রি বিষয়টির অন্তর্ভুক্ত জেনেটিক্স কার্ডটির (মেডিকেল কলেজে কোনো বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত কোর্সকে 'কার্ড' বলে) পুরোটাই তুলে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে আরও অনেক কিছু পেলাম যা ওই কার্ডে ছিল না কিন্তু থাকলে ভালো হতো। ইতিহাস থেকে শুরু করে বায়োটেকনোলজি আর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, আবার জৈববিবর্তনের আলোকে জেনেটিক্সের বিশ্লেষণ, মলিকুলার বায়োলজি—কী নেই! কিন্তু তাই বলে বইটি কিন্তু একগাদা তথ্যের স্তূপ নয়।

t.me/Borno_boichoy

যেকোনো মজার কমিকের মতো একনিশ্বাসে আগাগোড়া পড়ে ফেলা যায়। পড়ার সময় আমার মনে হচ্ছিল, ইশ, প্রথম বর্ষে থাকতে যদি বইটি পেতাম তাহলে জেনেটিক্স কোর্সটাকে ওই রকম বিভীষিকা মনে হতো না। জটিল সব বিষয়ের কী আশ্চর্য সরল উপস্থাপন, অথচ সরল করতে গিয়ে 'অতি-সরল' ছেলেভোলানো গল্প হয়ে যায়নি। বইটি বোঝার জন্য স্কুলপর্যায়ের রসায়ন জ্ঞানই যথেষ্ট, অথচ বইটির বিষয়বস্তু স্নাতক পর্যায়ের।

এত অসাধারণ সব দিকের সমন্বয় ঘটেছে যে বইটিতে, তার ওপর বইটি হাতে লেখা ও আঁকা। এমন বইয়ের বৈজ্ঞানিক তথ্য, রসবোধ, শিল্পগুণ, নান্দনিকতা সবকিছু অবিকৃত রেখে পুরোপুরি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উপযোগী করে লেখা চাট্টিখানি কথা নয়! চমক যখন প্রথম কুড়ি পৃষ্ঠা লিখে আমাকে দেখতে দিল তখন তো আমি বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। চমক একজন ইঞ্জিনিয়ার; ইঞ্জিনিয়ারদের সম্পর্কে আমার আগে যে ধারণাই থাকুক তা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। আমার মনে হলো, চমকের রূপান্তরটি হয়তোবা মূল বইটিকেও অতিক্রম করে গেছে।

তারপর অন্তর্জালে তার সঙ্গে যখনই ভাববিনিময় হতো তখন বইটির কাজ কদ্দূর হলো তা বরাবর জানতে চেয়ে তাকে যথেষ্ট বিরক্ত করেছি। সে জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। প্রবাসে থেকে পড়াশোনার চাপ ও এত ব্যস্ততার মাঝেও এত চমৎকার একটা কাজ এত অল্প সময়ে সম্পন্ন করা বোধ হয় চমকের ক্ষেত্রেই সম্ভব। বাংলাদেশের বইয়ের বাজারের বর্তমান পরিস্থিতিতে এ রকম ভিন্নধারার একটি বই প্রকাশ করার সময়োপযোগী সামাজিক দায়িত্ব সাহসের সঙ্গে পালন করায় প্রকাশক অন্য রকম প্রকাশনীর যত বড় ধন্যবাদ প্রাপ্য তা দেওয়ার সামর্থ্য আমার নেই। শুধু ধন্যবাদ এ জন্য যথেষ্টও নয়।

বইটি পড়ে জেনেটিক্স সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা তো পাওয়া যাবেই, তার চেয়ে বড় কথা হলো, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে দেবে বইটি। খুব কম বইয়েরই এমন ক্ষমতা থাকে। তাও যদি সেটা জেনেটিক্সের মতো কাঠখোট্টা বিষয় হয় তবে তো কথাই নেই। যারা এই বইয়ের আগে জেনেটিক্সের আর কোনো বই পড়েননি তারা নিশ্চয়ই আমাকে গাল পাড়বেন জেনেটিক্সকে 'কাঠখোট্টা' বলার জন্য। তা আমি হাসিমুখে মেনে নেব।

সৌমিত্র চক্রবর্তী

পুনশ্চ:

'গল্পে-জল্পে জেনেটিক্স' বইটি মূল যে বইটি থেকে অনুপ্রাণিত সেই বইটাকে যদি আমি আর্জিনিন বলে ডাকি তাহলে কারও আপত্তি আছে? *Cartoon Guide to Genetics* সংক্ষেপে *CGC*, যা আর্জিনিনের জন্য নির্ধারিত কোডন। এই আঁতলামি-মার্কা রসিকতাটা বুঝতে হলে এখনই বইটা পড়া শুরু করুন। চমক উচ্চশিক্ষার্থে প্রবাসী হলো।

গল্পে-জল্পে জীবন...

জীববিজ্ঞান যে আমার খুব প্রিয় বিষয় ছিল, তেমন না। আমার মূল ভালোবাসা গণিত। কিন্তু একটা কৌতূহল সব সময় ছিল আমাদের শরীরকে নিয়ে। কুষ্টিয়ায় বড় হওয়ার কারণেই হয়তো বাউলগুরু লালন ফকিরের দর্শন আমার ওপর অনেক প্রভাব ফেলেছে। বাউলরা ভাবেন ঈশ্বরের আশ্রয় আসলে মানবদেহে, মানুষের শরীরকে জানলেই নাকি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জানা যায়। দেহতত্ত্বের এই দর্শন আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছিল মানবদেহকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে জানতে। এইচএসসি পড়ার সময় পাঠ্যবইয়ে মানবদেহ বলে একটা অধ্যায় ছিল, ওটাই ছিল আমার সব থেকে প্রিয় অধ্যায়। কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে ওই অধ্যায়টা আমাদের পড়িয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় নুরুজ্জামান স্যার। স্যারের কাছে অল্প কয়েক দিন প্রাইভেটও পড়েছি। অল্প সময় তবু এখনো একটা অদ্ভুত ভালো লাগা কাজ করে স্যারের কাছে পড়ার স্মৃতিটা মাথায় এলে। প্রতি ক্লাসের শেষে স্যার একটা সময় রাখতেন প্রশ্ন করার জন্য। জীববিজ্ঞান কিংবা জীবন নিয়ে যেকোনো প্রশ্ন তাকে করা যেত, 'স্যার, ব্যথা লাগলে চামড়া লাল হয়ে যায় কেন', 'এটা এমন কেন', 'ওটা অমন কেন?' সবাই ইচ্ছেমতো প্রশ্ন করত আর স্যার হাসিমুখে সবকিছুর ঠিক ঠিক উত্তর দিয়ে যেতেন। জীববিজ্ঞান নিয়ে যতটুকু ভালো লাগা, সেটা তার কারণেই। উদ্ভিদবিজ্ঞানের শিক্ষক রানা স্যারের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। জেনেটিক্সের প্রাথমিক বিষয়গুলো খুব সহজে বুঝিয়েছিলেন তিনি। এরপর প্রায় ছয় বছর আমি জীববিজ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ দূরে। ২০১০ সালে একটা ই-বুকের সন্ধান পেলাম 'এ কার্টুন গাইড টু জেনেটিক্স'। লিখেছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে স্নাতক কার্টুনিস্ট ল্যারি গনিক এবং ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া ডেভিসের মাইক্রোবায়োলজির অধ্যাপক মার্ক হুইলিস। ইতিহাসের শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত জেনেটিক্স কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে, মানুষের মাথায় কীভাবে চিন্তাগুলো এসেছে তার সব ইতিহাস এবং তত্ত্ব সেখানে কার্টুন দিয়ে বোঝানো, ভাবাই যায় না। এমন সব মজার কার্টুনে পুরো বই ভরপুর। হাসতে হাসতে যখন বইটা শেষ করেছি, তখন টের পেলাম এই রসিকতার ছলে আমি জীববিজ্ঞান যা শিখেছি, সেটা সমগ্র জীবনের সবচেয়ে অসাধারণ শিক্ষা। তখনই উপলব্ধি করি, এমন একটা বই বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য সত্যিকার অর্থেই প্রয়োজন। বইটাকে আমাদের দেশের উপযোগী করে রূপান্তর করার উদ্যোগ নিই। হ্যাঁ, 'গল্পে-

জল্লে জেনেটিক্স'-এর সব রসদ ওই বইটি থেকে সংগ্রহ করা। তাই মূল বইয়ের লেখকদ্বয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেই হবে।

কিছু মানুষ না থাকলে বইটা কখনোই শেষ করা হতো না। পাই ল্যাবসে চাকরি করার সময় সোহাগ ভাই (মাহমুদুল হাসান সোহাগ, পাই ল্যাবস ও অন্য রকম গ্রুপের অন্যতম স্বত্বাধিকারী) প্রায়ই তাগাদা দিতেন বইটা শেষ করার, তিনি তার অন্যরকম প্রকাশনী থেকে বইটা প্রকাশ করতে ইচ্ছুক। বেশি উৎসাহ দেখিয়ে বলে বলেছিলাম দেড় মাসেই শেষ করে ফেলব। সেটা লেগেছে দেড় বছর। কৃতজ্ঞ লিটন ভাইয়ের প্রতি, উদ্ভাস ও পরবর্তী সময়ে পাই ল্যাবসে অবস্থানের সময়গুলোতে তাকে দেখেই চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের দিক থেকে নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার তাড়না ও প্রেরণা পেয়েছি। লেখার বিভিন্ন পর্যায়ে বইয়ের চুম্বক অংশ স্নেহাস্পদ কামরুল, কিংবা উদ্ভাসের সহকর্মী শিক্ষকদের পাঠ করে শুনিয়েছি। ওদের হাসি হাসি মুখগুলো আমাকে দারুণ প্রেরণা জুগিয়েছে কাজটা চালিয়ে যাওয়ার। প্রথম প্রকাশের সময় অনেক খেটেছে সহমানুষ বহ্নি। তার কাছে আমার ঋণের বোঝা বেড়েই চলেছে। সাউথ ক্যারোলাইনায় আমার রুমমেট শোভন ভাইয়ের কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তিনি না থাকলে এই বই দূরে থাক, বইয়ের লেখকের অস্তিত্ব এত দিন থাকত কি না, সন্দেহ! নিরুপম দা-উপমা দম্পতি তাদের নিঃস্বার্থ সহযোগিতা দিয়ে আমার কাজটাকে এগিয়ে নেওয়ার প্রেরণা জুগিয়েছে, কৃতজ্ঞতা তাদের প্রতিও। আমার লেখক-বন্ধু হিমালয় প্রথম প্রকাশের সময় যাবতীয় ঝামেলা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে; কৃতজ্ঞতা শব্দটা ওর জন্য যথেষ্ট নয়। বইয়ের নামটাও ওর ঠিক করে দেওয়া। নামকরণের কৃতিত্ব পুরোপুরি ওকেই দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ও নারাজ। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর আমরা ঐকমত্যে পৌঁছেছি ৪৭ দশমিক ৩ শতাংশ কৃতিত্ব ওর, ৪৯ দশমিক ৭ শতাংশ আমার আর বাকিটা সিস্টেমের! এই বইটা প্রকাশে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা যার কাছ থেকে পেয়েছি সে আমার চিকিৎসক-বন্ধু সৌমিত্র চক্রবর্তী। এমন মানুষ খুব বেশি পাওয়া যাবে না যে প্রচণ্ড ভালোবাসে গণিত, অথচ পড়ে ডাক্তারি এবং ডাক্তারি পড়াটাও জোর করে পড়ে না, পড়ে ভালোবাসা নিয়েই। বইটা লেখার শুরু থেকেই সে দারুণ উচ্ছ্বসিত। শেষ করতে ঢিলেমি করছি দেখে সে তো আলটিমেটামই দিয়ে বসে, 'আমার বিয়েতে বইটা গিফট চাই!' পড়ালেখার চাপে তার বিয়ের সময় বইটার কাজ শেষ করতে পারিনি, তবে দেরিতে হলেও গিফট হিসেবে আমার হাতের লেখা মূল পাণ্ডুলিপিটা তাকে দিয়েছি।

বইটা কারা পড়বে, এ নিয়ে প্রশ্ন ওঠা অবান্তর নয়। আমি মনে করি, ক্লাস নাইন-টেন অথবা তার বেশি বয়সী যে কেউ বইটি পড়তে পারবে। শিক্ষা উপকরণ হিসেবে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও ব্যবহার করতে পারবেন। আমদের দেশে জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড শুরু হয়েছে। সেখানেও বইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। প্রথম প্রকাশের সময় যা ভুলত্রুটি ছিল তার কিছু কিছু শুধরে নিয়েছি। তবু যদি কোনো ত্রুটি চোখে পড়ে সেগুলো ধরিয়ে

দিলে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ থাকব, চেষ্টা করব পরবর্তী সময়ে ঠিক করে নেওয়ার। আর কথা না বাড়াই। অনেক দিন আগের মানবসমাজ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, যারা ভাবত এই মহাবিশ্বের সবকিছুই আসলে জীবিত...

চমক হাসান
ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র
২৯ জানুয়ারি, ২০২০

T.me/Borno_porichoy

পৃষ্ঠা

১০ অনেক অনেক দিন আগে
- কী ভাবত প্রাচীনকালের মানুষ?

১৬ ব্যবহারিক জিনতত্ত্ব

১৯ জ্যাকবের ভেড়ার পালের কাহিনি

২৭ বিজ্ঞান এগিয়ে চলল
- নতুন নতুন ধারণার জন্ম

৩৩ স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া

৩৭ *ex-ovo-omnia*

৪২ টু ব্রিড অর নট টু ব্রিড

৪৭ ধর্মযাজক খুঁজে পেলেন জিনে

৬৬ এবার তুমি ওদের দেখতে পাবে

৭৯ মানচিত্র তৈরি

৮৯ মিউটেশন

৯৪ লিঙ্গ নির্ধারিত হয় কী দিয়ে?

১০১ x-রেটেড জিনে

T.me/Borno_porichoy

অনেক অনেক দিন আগে ...

T.me/Borno_porichoy

আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রকৃতি সম্বন্ধে সামান্যই জ্ঞান রাখত। তখন প্রত্যেকেই ছিল একেক জন জীববিজ্ঞানী আর গোটা পৃথিবীই ছিল তাদের পাঠশালা!!

Free/Borno_Porichoy

বলা হয় যে একেবারে শুরুর দিকে মানুষ জীব আর জড় পদার্থের ভেতর কোনো পার্থক্য করত না। সবকিছুই তাদের জীবিত বলে মনে হতো। জড়বস্তুকেও তারা 'জীববিজ্ঞানের গবেষণার উপযুক্ত বিষয় মনে করত।

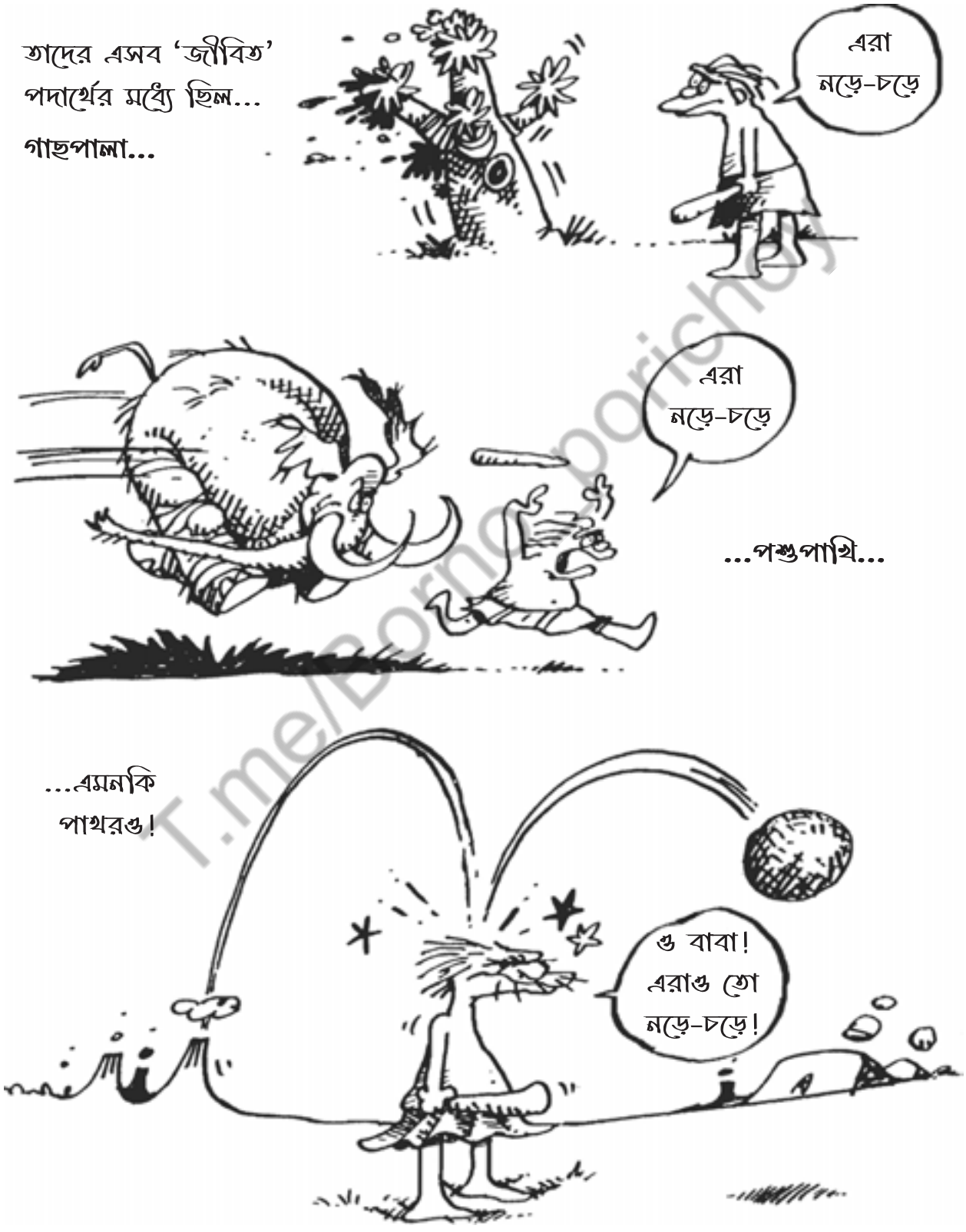

T.me/Bornoporichoy

গবেষণা করতে করতে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার আমাদের পূর্বপুরুষরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছিল: কিছু কিছু জিনিস তাদের বংশবৃদ্ধির চেষ্টা করে।

...আর সেই সহজ-সরল মানুষগুলোর কাছে এটা মনে হওয়াটাও অস্বাভাবিক কিছুই নয় যে, বড় বড় পাথরও বংশ বৃদ্ধি করে এবং ছোট ছোট নুড়িপাথরের 'জন্ম' দেয়।

T.me/Boi_porichoy

অনেক পণ্ডিতই মনে করেন, সেই আদিম যুগের মানুষেরা ভাবতেই পারেনি যে বংশবৃদ্ধির সঙ্গে নারী-পুরুষের মিলনের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে। গর্ভ হওয়া আর সন্তান জন্ম দেওয়ার মাঝের নয় মাসের সময়ের ব্যবধানটুকুই সে সময়ের সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোকটিকেও বিভ্রান্ত করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। আর তা ছাড়া...পাথরের বংশবৃদ্ধিতে মিলনের কীই-বা ভূমিকা থাকতে পারে?

এটা মানতেই হবে যে, পণ্ডিতদের এই তত্ত্ব আমাদের কিছুটা সংশয়ে ফেলে দেয়। পুরুষেরা না হয় বংশবৃদ্ধির সঙ্গে মিলনের এই সম্পর্কটা নাই-বা বুঝতে পারল, কিন্তু নিজের শরীরে যে পরিবর্তন ঘটছে সেটাকে নারীরা কীভাবে অগ্রাহ্য করবে?

T.me/Borno_Porichoy

এই তত্ত্ব বলে যে, যখন সভ্যতার সূচনা হলো এবং মানুষ বন্য পশুকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত বানাতে শিখল, তারা খুব কাছ থেকে দেখতে পারল প্রাণীগুলোর বংশবৃদ্ধির পর্যায়গুলোকে। তারা দেখল, এক ঋতুতে ওরা মিলিত হলে পরের ঋতুতে ওদের বাচ্চা হয়।

পুরুষেরা নিশ্চই বেশ বড় ধাক্কা খেয়েছিল, যখন তারা বুঝতে পারল, সন্তান জন্ম দেওয়াতে তাদের ভূমিকা আছে। বলা হয় যে, এর ফলে সমাজে বড় বড় পরিবর্তন ঘটে যায়...। সৃষ্টি হয় 'বাবা' দিবস, 'পুরুষদের পোশাক','বিয়ে', 'পুরুষশাসিত সমাজ' এমন সব নতুন নতুন ধারণা। যা-ই হোক—আমরা আর ওই দিকে আগাব না। এটা তো সমাজবিজ্ঞানের বই না, এটা জীববিজ্ঞানের বই...

amarboi.org

সেই সঙ্গে জন্ম নিল এজাতীয় কিছু প্রবাদ—যেমন বাপ তেমন ছেলে! এটিই প্রথম ধারণা যাকে জিনতত্ত্ব পুরোপুরি সমর্থন দেয়। আর এভাবেই শুরু হলো

ব্যবহারিক জিনতত্ত্ব

অথবা বেছে বেছে প্রজনন ঘটানোর পদ্ধতি (*selective breeding*)। পশু পালকেরা তাদের পশুর প্রজননকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করল। সবচেয়ে ভালো পশুগুলোকে প্রজননের জন্য নির্বাচন করল এবং খারাপগুলো থেকে মুক্তি পেতে চাইল।

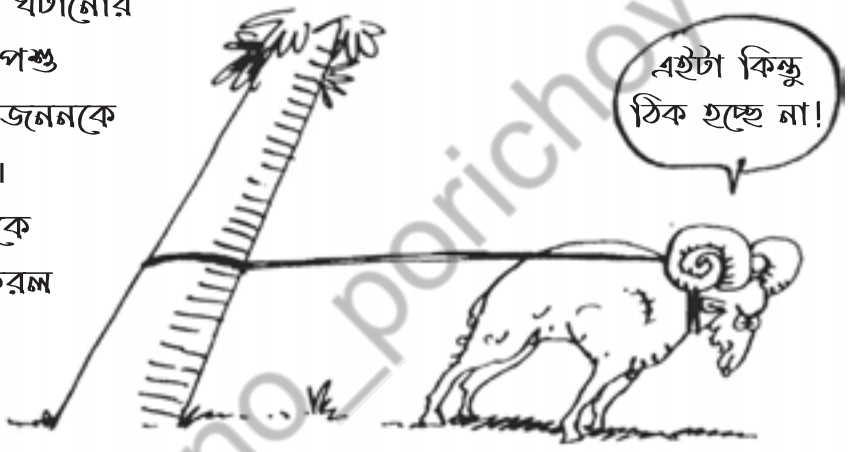

ফলাফল?

শক্ত-সোমত্ত বুনো পশুগুলো থেকে যে বাচ্চাগুলো পাওয়া গেল, সেগুলো হলো নরম-সরম, পশমে ভরা আর একেবারেই ভেড়া-ভেড়া!!

T.me/Borno_porichoy

একই সময়ে মানুষ গাছপালাও পোষ মানানোর চেষ্টা করছিল।

প্রথমদিকের কৃষকেরাও পশুপালকের মতো একই পদ্ধতি বেছে নিয়েছিল। আগাছাগুলো ফেলে দিয়ে সবচেয়ে ভালো বীজগুলোই বপন করেছিল তারা।

এমনই ঘটেছিল পৃথিবীর সব জায়গায়। অপ্রয়োজনীয় আগাছা আর ঘাসগুলোকে সরিয়ে জায়গা করে নিল সব উচ্চফলনশীল শস্য। এশিয়ায় জন্মাল ধান, গম, বার্লি আর খেজুর; আমেরিকায় ভুট্টা, টমেটো, আলু আর মরিচ এবং আফ্রিকায় পাওয়া গেল -আলু, বাদাম, আর লাউ। এদের সবই ছিল মানুষের বিশেষ গবেষণার ফসল।

T.me/Boimo_porichoy

গাছপালার মধ্যেও যৌনতার ব্যাপার আছে। প্রাণীদের চেয়ে এ ব্যাপারে এদের সাড়াশব্দ একটু কম পাওয়া যায়, এই যা! মানুষ আগেই পরাগায়নের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিল। তারা খেয়াল করেছিল, ফুলের ওপর পরাগরেণু না পড়লে সেই ফুল থেকে উর্বর বীজ পাওয়া যায় না।

তারপরও—

প্রথমদিকের কৃষকেরা আসলেই জানত না, পরাগায়ন কীভাবে কাজ করে। তাই এর ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য তারা আশ্রয় নিল জাদুবিদ্যার, বলল এর মধ্যে জাদু আছে! পাশের ছবিতে যাদের দেখা যাচ্ছে, এরা হলেন দুজন অ্যাসিরীয় (বর্তমানে ইরাক যেখানে অবস্থিত তার কাছাকাছি) ধর্মযাজক। তারা একটা খেজুরগাছে মন্ত্র পড়ে পরাগায়ন ঘটাচ্ছেন! এটা খ্রিষ্ট জন্মের প্রায় ৮০০ বছর আগের কথা।

T.me/Borno_porichoy

বিজ্ঞান ও জাদুবিদ্যার এই সমন্বয়ের ব্যাপারটি দারুণভাবে ফুটে উঠেছে বাইবেলের একটি গল্পে... জেনেসিস, চ্যাপ্টার-৩০-এ

জ্যাকবের ভেড়ার পালের কাহিনি

এই গল্পে দেখা যায়, সমাজপ্রধান জ্যাকব তার শ্বশুর লাবানের ভেড়ার পাল চরাতে রাজি হন। তাদের ভেতর শর্ত থাকে, কালো ছোপওয়ালা ভেড়ার পাল জ্যাকব নিজে রেখে দেবেন আর যেগুলো পুরোপুরি কালো সেগুলো লাবানের কাছে থাকবে। এই দুই দলের ভেতর অর্থাৎ এক দলের একটি ভেড়ার সঙ্গে অন্য দলের কোনো ভেড়ার প্রজনন ঘটানো যাবে না।

বাইবেলে বেশ যত্ন নিয়ে জ্যাকবের 'উর্বরতার জাদু' বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি উইলোগাছের কয়েকটি ছড়ি থেকে ছাল-বাকল তুলে ফেলে গুগুলোকে সাদা বানিয়ে ফেললেন। এরপর সেগুলোকে তিনি একটি জলাশয়ের পাশে ফেলে রাখলেন।

জ্যাকবের এই কাজের পেছনে তার যে ধারণা কাজ করেছিল তা হলো **'রতনে রতন চেনে'**। উইলোর সাদা ছড়ি দেখিয়ে তিনি লাবানের পুরোপুরি কালো পশুগুলোর ভেতর থেকে সাদা ছোপ বের করে আনতে চাইছিলেন!! এটাকে বলা হয়-

অনুকরণের জাদু

জিনতত্ত্বকে মেনেই বলছি, দেখা গেল, লাবানের পুরোপুরি কালো ভেড়াগুলো **সাদা ছোপ-ছোপ ভেড়ার জন্ম দিল,** যার ফলে বেড়ে গেল জ্যাকবের ভেড়ার সংখ্যা! কেন এমন হলো??

চিন্তা নেই, আমরা পরে আবার ফিরে আসব এ বিষয়ে!

এখানেই আমরা দেখি জিনতত্ত্বের কিছুটা জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে প্রায় কিছুই না-জানা মানুষের বোঝার পার্থক্য–

অন্তত লাবান ব্যাপারটার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারলেন না!

প্রাচীনকালের ইতিহাসে পাওয়া যায় জিনতত্ত্ব-সংক্রান্ত আরও কিছু ঘটনা।

চীন দেশীয়রা আবিষ্কার করেছিল 'নাচনেওয়ালা' ইঁদুর, যার আসল কারণ ছিল একটা মিউটেশন। কোন প্রাণীতে এই মিউটেশনটা ঘটলে তাদের মধ্যে চক্রাকারে ঘোরার প্রবণতা তৈরি হয়। মিউটেশন কী? অসুবিধা নেই আমরা পরে জানাব...।

হিন্দুরা লক্ষ করেছিল, কিছু কিছু রোগবালাই বংশানুক্রমে চলে আসে। তার ওপর তারা বিশ্বাস করত সন্তানের সমস্ত গুণাবলিই মা-বাবার কাছ থেকেই আসে। 'মনু'র শাস্ত্রে বলা হয়েছে নীচু বংশের কোনো মানুষ কখনোই তার স্বভাব ভুলতে পারে না!

প্রাচীন গ্রিসের জেনোফন তার কুকুরের প্রজনন ঘটানোর সময়ে উক্তি দিয়েছিলেন:

গ্রিসের অনেক পণ্ডিত জেনোফন থেকে আরও গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন এ বিষয়গুলো নিয়ে। আসলে তারা প্রথমবারের মতো চিন্তা করেছিলেন বংশগতিবিদ্যার তত্ত্বগুলোকে নিয়ে। তারা প্রশ্ন করেছিলেন—

সন্তান কেন বাবা-মায়ের মতো হয়?

গ্রিসের মহান দার্শনিক **সক্রেটিস** অবাক হতেন, কেন মাঝে মাঝে সন্তান বাবা-মায়ের মতো হয়ও না। তিনি বলতেন, 'দেখো, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বড় বড় পদে যারা বসে আছে, তাদের ছেলেমেয়েরা হয় অলস, নিষ্কর্মা, কিছুই পারে না ওরা।' আমাদের মনে রাখা উচিত সন্তান কিন্তু তার 'সমস্ত' গুণাবলিই মা-বাবার কাছ থেকে পায় না...

কিন্তু খেপে গেল এথেন্সের জনগণ। সক্রেটিসের অকপট সততাই তাকে ঠেলে দিল মৃত্যুর মুখে...

সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন গ্রিসের বিখ্যাত ডাক্তার—**হিপোক্রেটিস**

হিপোক্রেটিস বুঝতে পেরেছিলেন সন্তানের বৈশিষ্ট্য নিরূপণে বাবার যেটুকু অবদান সেটা প্রবাহিত হয় বীর্যের মাধ্যমে। এ থেকে তিনি অনুমান করলেন, নিশ্চয়ই নারীদেহের ভেতরও এমন কোনো রস আছে।

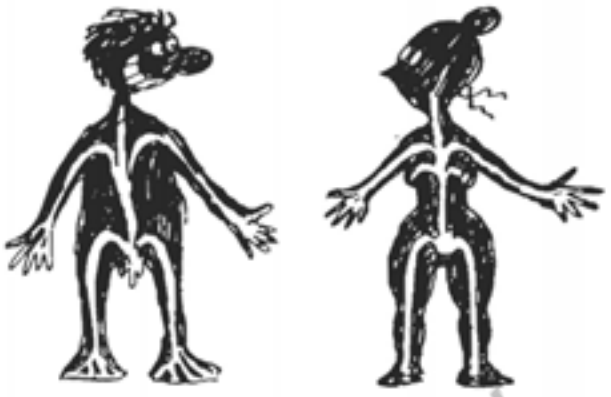

তিনি বললেন—এই তরলগুলো সারা দেহের বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হয়, আর তারপর জননাঙ্গে এসে জমা হয়।

আঙুল থেকে যে বীর্যরস আসে, তার মধ্যে থাকে আরও আঙুল তৈরির উপাদান। চুল থেকে আসে আরও চুল তৈরির উপাদান, ইত্যাদি, ইত্যাদি

গর্ভ হওয়ার সময় বাবার রস আর মায়ের রসের ভেতর একধরনের যুদ্ধ হয়। সন্তানের আঙুলগুলো দেখতে বাবার মতো হবে না মায়ের মতো, সেটা এই যুদ্ধের ওপর নির্ভর করবে। যার আঙুলের রস যুদ্ধে জিতবে, সন্তানের আঙুল দেখতে তার আঙুলের মতো হবে!

T.me/Borno_Porichoy

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, যার চিন্তাচেতনা পরবর্তীকালে মানুষকে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করেছে, তার নাম হিপোক্রেটিস নয়, তিনি হলেন **অ্যারিস্টটল**। বিজ্ঞানের ব্যাপারে তিনি যেন সবকিছু জানতেন! সব ব্যাপারেই কোনো না কোনো তত্ত্ব দিয়ে দিতেন!!

অ্যারিস্টটল বক্তৃতা দেওয়ার সময় পায়চারি করতেন বলে তাকে বলা হতো 'ভ্রমণরত'(*The Peripatetic*)। তো, তিনি মনে করতেন সন্তানের সব বৈশিষ্ট্যই আসে বাবার কাছ থেকে, বীর্যরসের মধ্য দিয়ে। আর মায়ের কাজ হলো সন্তানের শরীরটা যেসব উপাদান দিয়ে তৈরি হবে, সেসব সরবরাহ করা!

T.me/Boimo_porichoy

হ্যাঁ, আসলেই এ ব্যাপারে তার কোনো চিন্তা ছিল না। তার এই মতবাদ থেকে এটাই মনে হয় যে সব সন্তানই হবে ছেলেসন্তান। কে জানে, হয়তো এই মতবাদ থেকে অ্যারিস্টটলের অবচেতন মনের গোপন ইচ্ছা সম্পর্কেই ধারণা পাওয়া যায়! প্রাচীন গ্রিসের মানুষ নিঃসন্দেহে মেয়েদের থেকে ছেলেদের অনেক বেশি উঁচু মর্যাদার ভাবত!

কিন্তু দার্শনিক তো মেয়েশিশুর অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করতে পারেন না! তিনি তার মতবাদকে সংশোধন করলেন এই ভাবে— গর্ভাবস্থায় মায়ের রক্ত যদি কোনো ‘ঝামেলা’ তৈরি করে, তখন মেয়েশিশু জন্ম নেয়...

T.me/Borno_porichoy

তত্ত্ব হিসেবে এটা খারাপ ছিল না, কিন্তু সমস্যা হলো, যেসব সন্তান বাবা-মা দুজনার চেয়েই আলাদা হয়, তাদের ব্যাপারে এটি কী বলবে? প্রায়ই দেখা যায়, বাবা-মা দুজনার চোখের রং বাদামি কিন্তু সন্তানের চোখের রং নীল! আর...জ্যাকবের ভেড়াগুলোর কথাই বা আমরা ভুলে যাচ্ছি কেন?

এ ব্যাপারে **ইম্পেডোক্লিস** নামে এক দার্শনিকের মতবাদ ছিল বেশ মজার। তার বক্তব্য ছিল— নারীরা যদি গর্ভাবস্থায় কোনো পুরুষ মূর্তির দিকে মুগ্ধ চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে, তখন এমন ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে...!

T.me/BornoPorichoy

গ্রিক সভ্যতা বিলীন হয়ে যেতে পারে, তাই বলে জ্ঞানের সাধনা তো থেমে থাকতে পারে না।

বিজ্ঞান

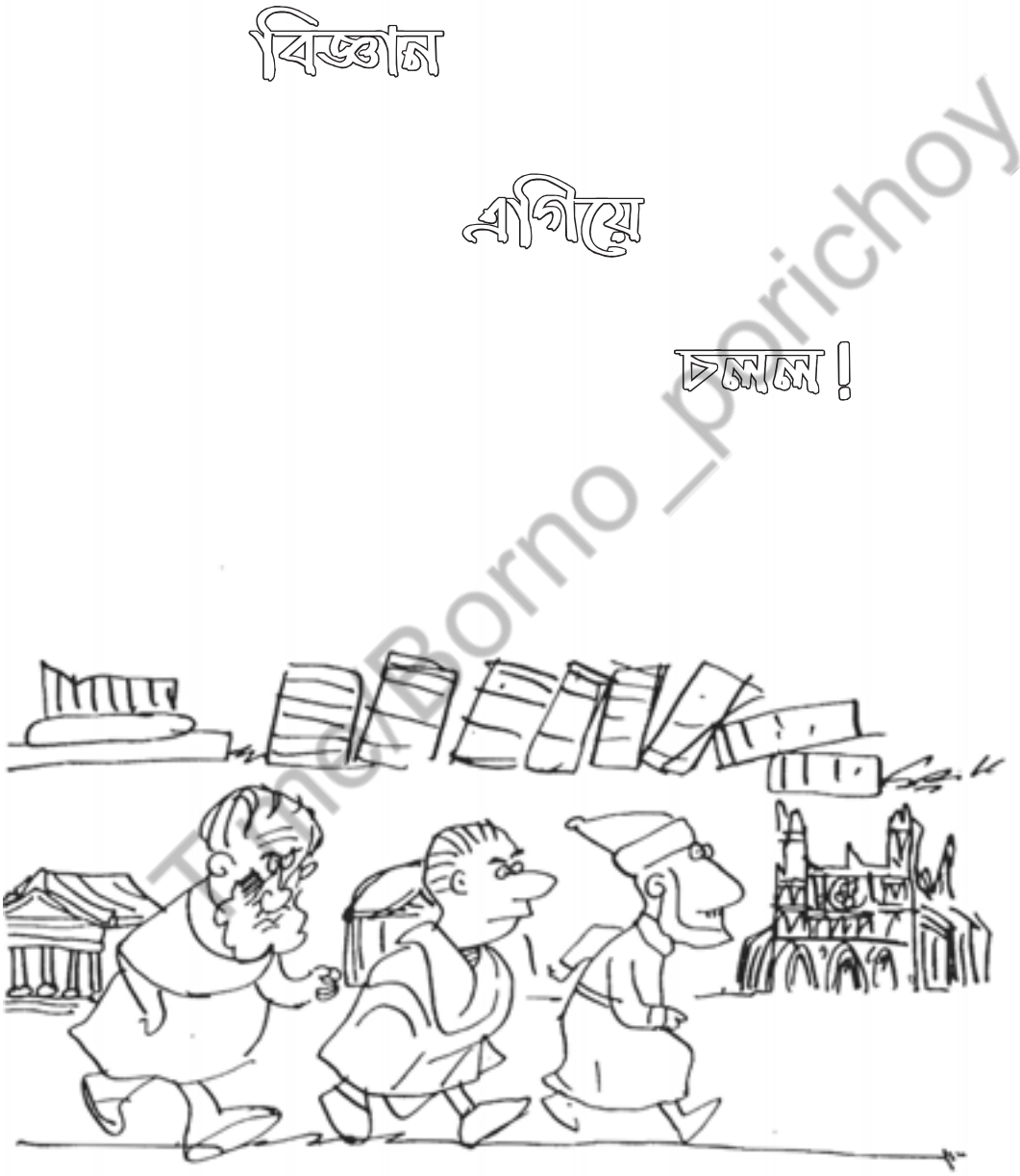

এগিয়ে

চলল !

TheBorno_porichoy

গ্রিকরা তাদের জ্ঞানের মশাল দিয়ে গেল রোমানদের হাতে। দর্শনচর্চায় রোমানদের তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না। জীবনের বিজ্ঞানের চেয়ে মারণাস্ত্রের প্রযুক্তির ব্যাপারে তাদের উৎসাহ ছিল বেশি।

জিনতত্ত্ব বিষয়ে একটিমাত্র নতুন ধারণা তারা যোগ করেছিল- মেয়ে ঘোড়াগুলো পুরুষ ঘোড়ার সাহায্য ছাড়াই, শুধু বাতাসের দ্বারাই সন্তান ধারণের যোগ্যতা লাভ করতে পারে!!

T.me/Borno_porichoy

T.me/Borno_Porichoy

মধ্যযুগের একটা ধারণা, মানুষের চিন্তাভাবনাকে দারুণভাবে বাধা দিয়েছিল। এটাকে বলে স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বা

গ্রিকদের মাথাতেই এ ধরনের চিন্তা প্রথম এসেছিল যে, জড় পদার্থের বা মৃতবস্তুর ভেতর থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে জীবিত প্রাণিসত্তা জন্ম নিতে পারে। মধ্যযুগীয়রা তাতে আরও রংচং মাখাল।

তারা মনে করত, পচা মাংস থেকে লার্ভা বা শূককীট জন্ম নেয়। ঘোড়ার লেজ একসময় পোকা হয়ে যায়; পচা কাদা জীবিত হয়েই আসলে ব্যাঙ, ইঁদুর ও অনেক পোকামাকড়ের জন্ম দেয়।

t.me/Borno_porichoy

স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার অদ্ভুত ধারণাটা কেন সবাই সহজে মেনে নিয়েছিল, এটা বোঝাটাও কঠিন কিছু না। কাদা তো যেখানে-সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। তারা দেখত সেই কাদা থেকে ব্যাঙ, পোকামাকড় বের হয়ে আসছে। এমন ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই তাদের চোখে পড়ত।

স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া নিয়ে ভাবলে আসলে জিনতত্ত্বের কোনোই দরকার পড়ে না। ব্যাঙ যদি কাদা থেকেই জন্মায় তাহলে বংশানুক্রমে সে কার বৈশিষ্ট্য পাচ্ছে—এমন চিন্তা কি অর্থহীন হয়ে যায় না?

কিন্তু তারপরও, আগে যেমন বলেছিলাম— বিজ্ঞান এগিয়ে চলল।

এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে একটা সহজ পরীক্ষা স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার ধারণাকে প্রায় উড়িয়ে দিল!

TheBanglaBook.org

অনেক যত্ন নিয়ে এ পরীক্ষাটি করেছিলেন ইতালীয় বিজ্ঞানী

ফ্রান্সিসকো রেডি

রেডি দুই টুকরো মাংস নিয়ে দুটি পাত্রের মধ্যে রাখলেন। একটি পাত্রের মুখ পনীর লাগানো কাপড় দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিলেন। অন্য পাত্রটা খোলা রাখলেন যেন মাছি বসতে পারে।

বেশ কিছু সময় পরে তিনি দেখলেন, শুধু খোলা পাত্রটাতেই লার্ভা জন্মেছে।

রেডি দেখলেন, লার্ভাগুলো বড় হলো, গুটি তৈরি করল, তারপর একদিন পুরোদস্তুর মাছি হয়ে উড়ে চলে গেল।

এভাবে রেডি দেখালেন যে লার্ভাগুলো মাছির কারণেই জন্মেছে এবং মাছিগুলোও লার্ভা থেকেই এসেছে। পচতে থাকা মাংসের টুকরো থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দৃশ্যমান কোনো কিছুই জন্ম নেয়নি।

T.me/Boi_Poricha

এরপরও স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার ধারণা কিন্তু তখনো পুরোপুরি বাতিল হয়ে যায়নি।

মানুষ তারপরও বিশ্বাস করত বালু থেকে মাছি হয়, শস্যদানা থেকে গুবরে পোকা হয়, শিশির থেকে মাছ হয় ইত্যাদি ইত্যাদি...

কিন্তু, মাছি, মাছ আর গুবরে পোকার ধারণা এক এক করে উড়িয়ে দিলেন শখের বিজ্ঞানী

অ্যান্টন ভন লিউয়েনহুক

এই ডাচ বিজ্ঞানীই আমাদের শেখালেন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে কত দারুণ সব কাজ করা যায়।

T.me/Borno_porichoy

এরপর মধ্যযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা আরও ঝিমিয়ে পড়ল। বংশগতিবিদ্যার তত্ত্বগুলো গল্প-কাহিনিতে কিছু 'দানবাকৃতির' জীবের জন্মের পথ সুগম করে দিল।

এগুলোর মধ্যে কিছু ঘটনা হয়তো সত্যি ছিল। তাই বলে গল্প যদি এমন হয় যে, 'একদা বজ্রপাতের সময় অর্ধেকটা গরু স্বর্গ থেকে মাটিতে পড়ল'—এটা কী একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যায় না?

এ ধরনের ক্ষেত্রে এমন সম্ভাবনাই বেশি যে, হয় এটা নিছকই একটা আষাঢ়ে গল্প আর নয় মানুষকে বোকা বানিয়ে মজা করার জন্য এমন গল্প বানানো হয়েছে।

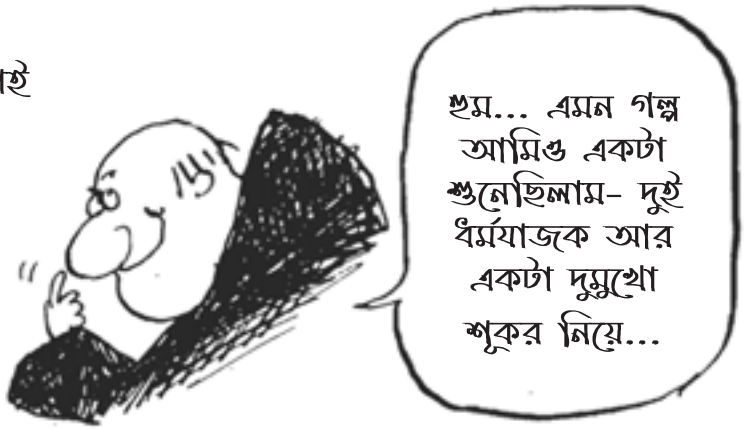

T.me/Borno_porichoy

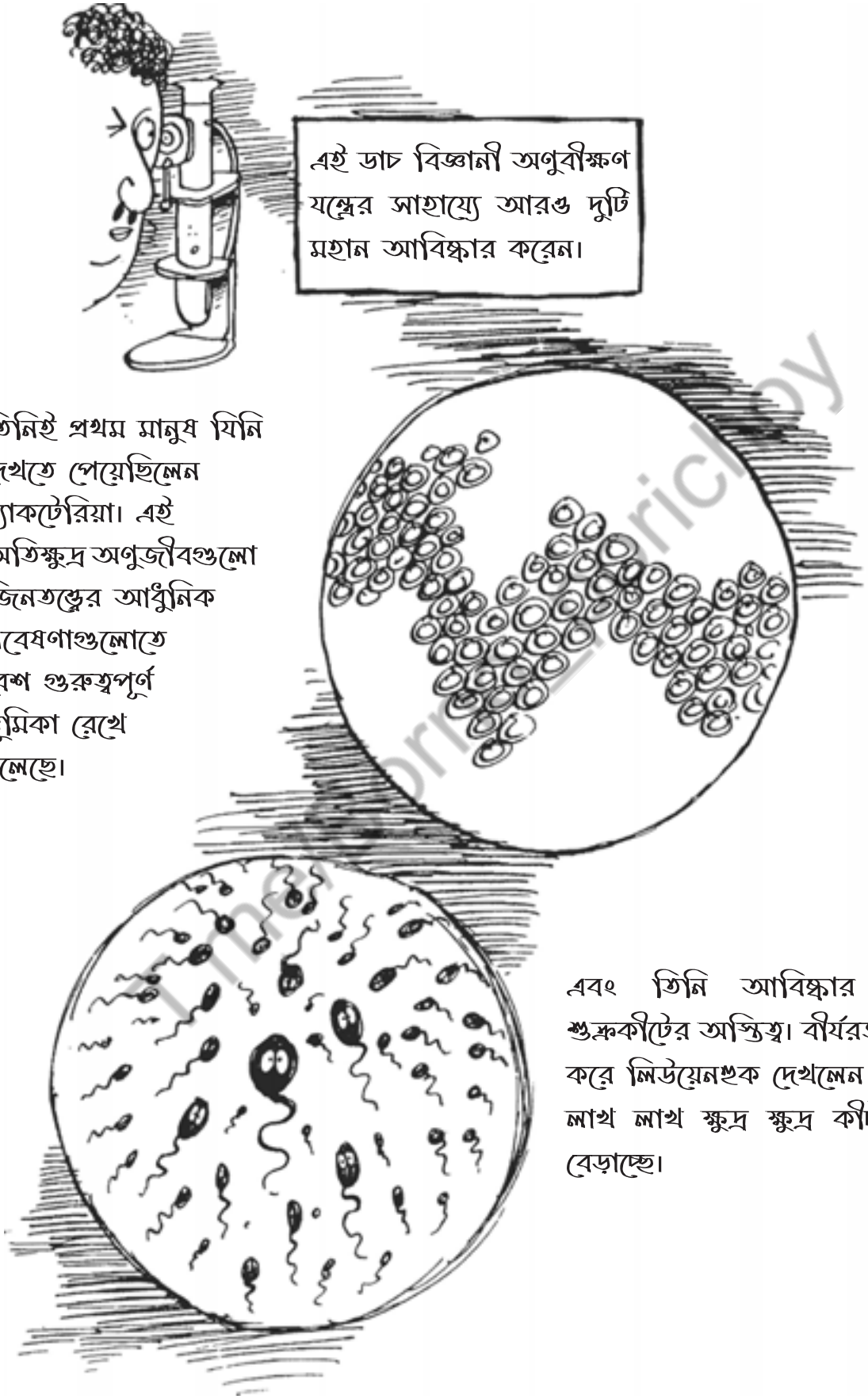
এই ডাচ বিজ্ঞানী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আরও দুটি মহান আবিষ্কার করেন।
তিনিই প্রথম মানুষ যিনি দেখতে পেয়েছিলেন ব্যাকটেরিয়া। এই অতিক্ষুদ্র অণুজীবগুলো জিনতত্ত্বের আধুনিক গবেষণাগুলোতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।
এবং তিনি আবিষ্কার করলেন শুক্রকীটের অস্তিত্ব। বীর্যরস পরীক্ষা করে লিউয়েনহুক দেখলেন এর মধ্যে লাখ লাখ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট সাঁতরে বেড়াচ্ছে।

এই আবিষ্কার মানুষের ভেতর ভুল ধারণা সঞ্চার করল। অনেকেই ভাবল, নতুন একধরনের কীটের সন্ধান পাওয়া গেছে।

লিউয়েনহুক নিজেই বিশ্বাস করতেন যে এই শুক্রাণু-কোষগুলোর প্রতিটির ভেতর একটি করে অতিক্ষুদ্র এবং স্বতন্ত্র জীব রয়েছে।

কিন্তু এ ধারণাটি স্পষ্টতই নতুন সমস্যার জন্ম দেয়, যদি কোষের ভেতরের জীবটি পুরুষ হয়, তার নিশ্চয়ই ক্ষুদ্র একটা শুক্রাশয় থাকবে। সেখানে আরও ক্ষুদ্র শুক্রাণুর কোষ থাকবে। সেই কোষের ভেতর আরেকটা জীব থাকবে। সেই জীব যদি পুরুষ হয়...এরূপ ভয়াবহ খেলা অনন্তকাল ধরিয়া চলিতে থাকিবে।

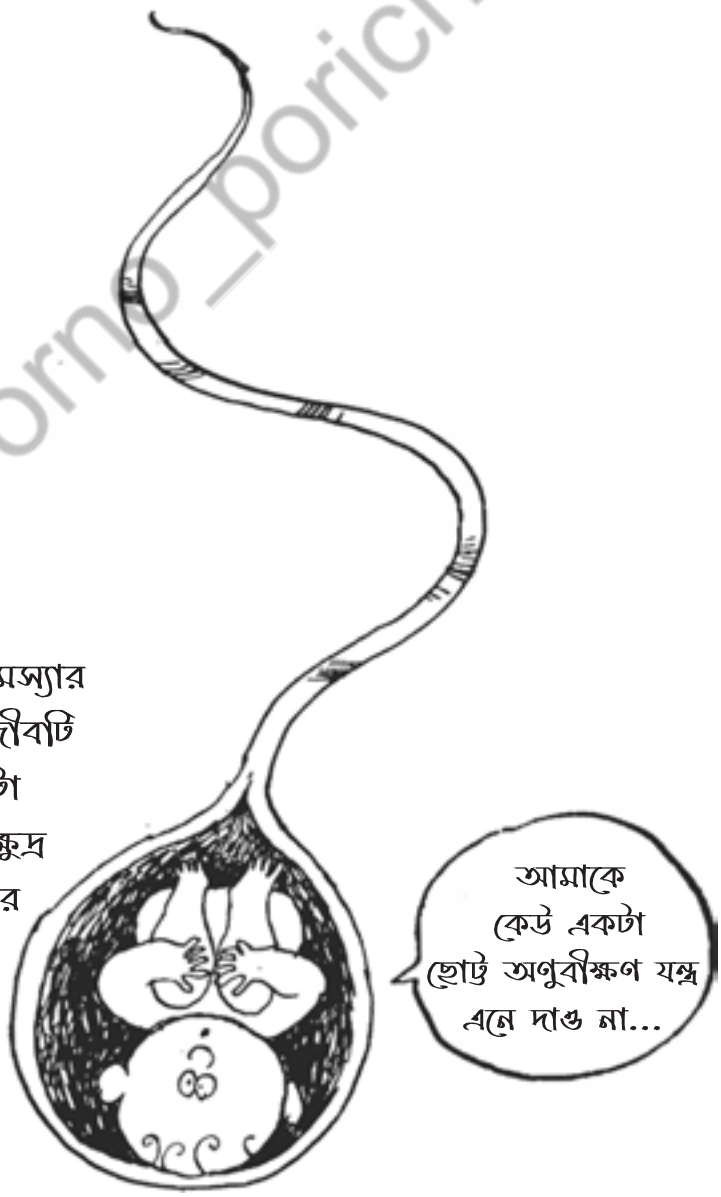

t.me/Borno_porichoy

EX OVO OMNIA

যখন লিউয়েনহুক শুক্রাণু নিয়ে নানা রকম চিন্তাভাবনা করছিলেন, অন্য বিজ্ঞানীরা তখন ভাবছিলেন বংশবৃদ্ধিতে মেয়েদের ভূমিকাটা আসলে ঠিক কেমন!

উইলিয়াম হার্ভে

(১৫৭৮–১৬৫৭) মুরগির ভ্রূণ কীভাবে বেড়ে ওঠে তা নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি দারুণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করলেন। *EX OVO OMNIA* বা ডিম থেকেই আসে সব। তিনি নিশ্চিত ছিলেন সব প্রাণিকুল ডিম থেকে জন্মায়।

কিন্তু স্তন্যপায়ীরা তো ডিম পাড়ে না। হার্ভে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলেন স্তন্যপায়ীদের ডিম!

তিনি দেশের রাজাকে রাজি করালেন যেন রাজার হরিণের বাগানে তাকে ডিম খোঁজার অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি অনেকগুলো হরিণ মারলেন, ব্যবচ্ছেদ করলেন কিন্তু হরিণের ডিম খুঁজে পেলেন না। শেষ পর্যন্ত হার্ভেকে হার মানতে হলো।

২০০ বছর ধরে তার মতের অনুসারীরা ডিম খুঁজেই চলল। কিন্তু...কেউ খুঁজে পেল না সেই ছলনাময়ী ডিম!

কেন মানুষ খুঁজে পায়নি সেটা বোঝাটা খুব কষ্টকর কিছু নয়। স্তন্যপায়ীর ডিম শুধু যে অতিক্ষুদ্র ও আণুবীক্ষণিক তা-ই নয়, এটা বেশ দুষ্প্রাপ্যও বটে।

স্তন্যপায়ীরা খুবই অল্প ডিম পাড়ে। পুরুষদের কোটি কোটি শুক্রকোষের তুলনায় একজন নারী ডিম জন্ম দেয় মাসে মাত্র একটি। ডিম না বলে সেটাকে ডিম্বাণু বলাই ভালো।

T.me/Borno_Porichoy

কিন্তু বারবার ব্যর্থ হয়েও এই অনুসন্ধান চলতেই থাকল। আসলে এর পেছনে যথেষ্ট শক্তিশালী যুক্তি ছিল। নারী স্তন্যপায়ীদের শরীরে ডিম্বাশয় আছে, ডিম্বনালি আছে, 'ডিম্ব' থাকবে না, তা কী করে হয়?

ডিমের ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা এতটাই নিশ্চিত ছিলেন যে ১৮২৭ সালে যখন একজন বিজ্ঞানী শেষমেশ একটা কুকুরের ডিম্বাণু আবিষ্কার করলেন, কেউই তেমন একটা অবাক হননি; বরং সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন—যাক অবশেষে পাওয়া গেল।

আর যা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল সেটাও দূর হয়ে গেল—যখন অস্কার হার্টউইগ আবিষ্কার করলেন নিষেক প্রক্রিয়া হলো একটিমাত্র শুক্রাণু ও একটি ডিম্বাণুর মিলন।

T.me/BoiRboi_porichoy

এরই মাঝে...

উদ্ভিদের যৌনতার বিষয়েও বেশ অগ্রগতি সাধিত হলো।

১৭০০ সালের মধ্যে উদ্ভিদের যৌন আচরণের একটা বড় অংশ মানুষের সামনে তুলে ধরলেন বিজ্ঞানী ক্যামেরারিয়াস (১৬৬৫–১৭২১)।

ক্যামেরারিয়াস দেখালেন উদ্ভিদের দেহেও জননাঙ্গ রয়েছে, যেগুলোর গঠন অনেকটাই প্রাণিদেহের অঙ্গগুলোর মতো।

এবং তারা
সবার সামনে
বাতাসের মধ্যেই 'শুই'
কাজ করে... কী লজ্জা!
কী লজ্জা!

T.me/Bomo_porichoy

পুরুষ ফুলের পরাগধানিতে পরাগরেণু থাকে যাকে তুলনা করা যায় প্রাণীদের শুক্রাণুর সঙ্গে।

স্ত্রী-ফুলে থাকে গর্ভমুণ্ড, যেখানে পুরুষফুলের পরাগরেণু এসে লাগে।

এই পরাগরেণু (বা তার কিছু অংশ) এরপর ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ে ডিম্বাশয়, যেখানে নিষেক প্রক্রিয়ায় জন্ম নেয় বীজ।

মাঝে মাঝে কিছু ফুলে দেখা যায় যে একই ফুলে পুরুষের অংশ ও স্ত্রী অংশ দুটোই রয়েছে। সে ক্ষেত্রে অন্য ফুলের সাহায্য ছাড়াই তারা নিজেরা নিষিক্ত হতে পারে।

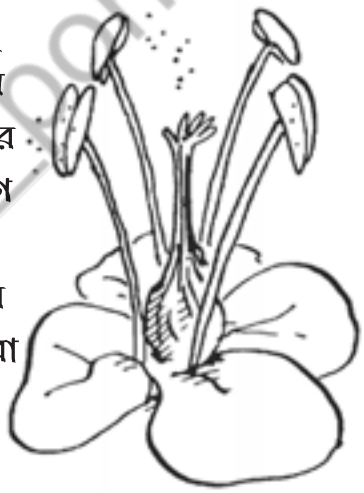

সুতরাং—

১৮০০ সালের প্রথম ভাগের মধ্যেই মানুষ বুঝে গেল, প্রাণী কিংবা উদ্ভিদে উভয়ই বংশবিস্তারেই যৌনতার ভূমিকা রয়েছে পুরুষদের থেকে আসে শুক্রাণু বা পরাগরেণু, আর নারীদের থেকে ডিম্বাণু। আর 'স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া' তখন প্রায় বিলুপ্তির পথে...

T.me/BanglaBook.org

TO BREED OR NOT TO BREED ?

এত সব বিজ্ঞানীর কথা শুনতে শুনতে সেই ব্যবহারিক জিনতত্ত্ববিদদের কথা ভুলে গেলে কিন্তু চলবে না—

যারা কৃষিকাজ করত আর যারা গৃহপালিত পশুদের প্রজনন নিয়ন্ত্রণ করত...। মাঠের মধ্যে এই নোংরা কাজগুলোর দেখভাল তারা নিজেরাই করত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগটা তাদের জন্যও ছিল বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাওয়ার সময়। এ সময়ে বলা যায় ব্যবহারিক কৃষিকাজ থেকেই জন্ম নেয় 'জিন' ধারণাটি।

দেখা যাক, কোন কোন বিষয় নিজ নিজ অভিজ্ঞতা থেকে তারা আগেই বুঝতে পেরেছিল।

১. কিছু কিছু সুস্থিত প্রজাতি রয়েছে, যারা খুবই ‘শুদ্ধবাদী’ ধরনের। এসব ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের বৈশিষ্ট্য যে রকম, সন্তানের বৈশিষ্ট্য ঠিক সে রকমই হয়ে থাকে। যেমন বাবা-মা দুজনার চোখের রং নীল হলে সন্তানের চোখের রং নীল হবেই। এ রকম বিশুদ্ধ প্রজাতির মধ্যে আরও আছে আরবের ঘোড়া, ল্যাব্রাডর রিট্রিভার নামের কুকুর, ‘ম্যাকিনটশ-অ্যাপল’ ইত্যাদি ইত্যাদি

অন্যদিকে কিছু কিছু প্রজাতি প্রজননের ক্ষেত্রে দারুণ বৈচিত্র্য দেখায়। জ্যাকবের ভেড়ার পালের গল্পটি এর একটা ভালো উদাহরণ। আবার, বাদামি চোখের দুজন মানুষের সন্তান নীল চোখের হতেও পারে।

২. দুই ধরনের দুটি প্রাণীর ভেতর প্রজনন ঘটিয়ে **সংকর** জাতীয় প্রাণীর জন্ম দেওয়া যায়। যেমন খচ্চর হলো অর্ধেক ঘোড়া, আর অর্ধেক গাধা। খচ্চর=ঘোড়া+গাধা! তাই বলে সব রকমের সংকর কিন্তু সম্ভব নয়।।।

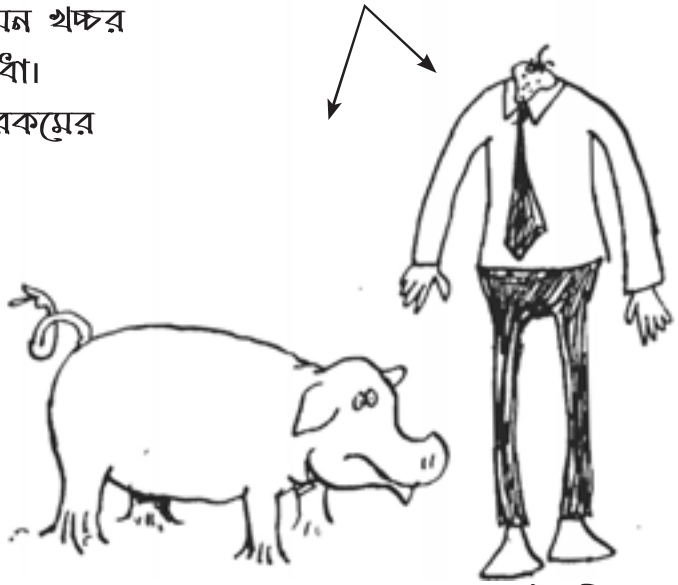

হাঁস ছিল, শজারু, (ব্যাকরণ মানি
না) হয়ে গেল ‘হাঁসজারু’ কেমনে
তা জানি না, বক কহে কচ্ছপে
বাহবা কী ফুর্তি! অতি খাসা
আমাদের বকচ্ছপ মূর্তি
—সুকুমার রায়

গাশূকর=গাছ+শূকর

মানুস্ট্রবেরি=মানুষ+স্ট্রবেরি।

T.me/Borno_boichoy

সংকরগুলো কেমন হবে তা আগে থেকে অনুমান করা খুবই কঠিন। তারা তাদের বাবা কিংবা মা— যেকোনো একজনের মতো হতে পারে। আবার দুজনের বৈশিষ্ট্য একসঙ্গে প্রদর্শন করতে পারে। আর যখন কোনো সংকরের সঙ্গে আরেকটা সংকরের প্রজনন ঘটানো হয়, বৈচিত্র্যের পরিমাণ চরমে গিয়ে পৌঁছায়...।

এ সব ধরনের জীবই এমনকি যারা 'শুদ্ধবাদী ধরনের, তারাও হঠাৎ- হঠাৎ এমন সন্তান জন্ম দেয়, যারা বাবা কিংবা মা কারও মতোই নয়। মাঝে মাঝে সেগুলো এমনও হয় যে দেখলে ভয় লাগে— বিকলাঙ্গ, বিকটদর্শন, যেন শুধুই মাংসের স্তূপ!

আবার মাঝে মাঝে সেগুলো মা-বাবা থেকে আলাদা হয় ঠিকই কিন্তু বেশি মাত্রায় না। ১৮০০ সালের দিকে যে মোটা ও খাটো পায়ের ভেড়াগুলো দেখা যেত, এগুলো তার উদাহরণ।

T.me/Borno_poricho

এমন অস্বাভাবিক সন্তানদের সঙ্গে স্বাভাবিক প্রজাতির জীবদের সংকরায়ন ঘটিয়ে ১৯ শতকের কৃষকেরা বেশ কিছু নতুন সুস্থিত প্রজাতি তৈরি করলেন। এদের মধ্যে ছিল নতুন ধরনের ধান, গম, বাদাম, শিংহীন গরু, খাটো ও মোটা পায়ের ভেড়া ইত্যাদি।

কিন্তু সংকরায়নের কোনো ভালো নিয়ম তারা জানত না। তারা বারবার এই প্রক্রিয়া ঘটিয়ে ঘটিয়ে দেখত। কখনো কখনো ভালো ফলাফল পেত, কখনো কখনো পেত না। তখন তারা ভাবতে শুরু করল, নতুন প্রজাতি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কেমন বৈশিষ্ট্যের জীব নিয়ে কাজ করা উচিত তার কোনো বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা আছে কি না?

T.me/Borno_porichoy

যা-হোক

অনেক চেষ্টার পরেও মা-বাবার বৈশিষ্ট্য কীভাবে সন্তানের ভেতর সঞ্চারিত হয় তার কোনো সামগ্রিক নিয়ম বের করা গেল না।

অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য নিয়ে একসঙ্গে চিন্তা করতে গিয়ে কিছু গবেষক চিন্তার খেই হারিয়ে ফেললেন।

গবেষকদের বাকিরা ঠিকমতো হিসাবই রাখতে পারলেন না যে, প্রজননের পর কোন বৈশিষ্ট্যের জীব কতগুলো জন্ম নিছে।

আসলেই, সমস্যাটার কাছে মানুষ অসহায় হয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে চিন্তা করা ছেড়ে দিলেন এবং সহজ সমস্যাগুলোর দিকে মনোযোগ দিলেন। আর সে কারণেই, বংশগতির সূত্রগুলো যখন সত্যি সত্যিই আবিষ্কৃত হলো, ৩০ বছর পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা সেটাকে পাত্তাই দিলেন না!

T.me/Borno_Porichoy

ধর্মযাজক খুঁজে পেলেন জিন—পৃথিবী হাই তুলল!

৫০ বছর ধরে গবেষণার পরও বংশগতির কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম আবিষ্কার করা গেল না। তবে নিঃসন্দেহে কাজটা খুব সহজ ছিল না। এমন একটা সূত্র আবিষ্কার করতে গেলে অমানুষিক ধৈর্য যেমন দরকার, তেমনি দরকার অসীম সময় আর...

ভাগ্যের দারুণ সহায়তা! এটা না হলে বোধ হয় আবিষ্কারটা সম্ভবই ছিল না!

অবাক হওয়ার কিছুই নেই যে ঘটনাটা ঘটেছিল এক ধর্মীয় আশ্রমে...

গ্রেগর মেন্ডেল

(১৮২২-১৮৮৪) ছিলেন সেন্ট অগাস্টিনের মতাদর্শের অনুসারী একজন খ্রিষ্টান ধর্মযাজক। তিনি গবেষণা করেন অস্ট্রিয়ার ব্রুন নগরের এক ধর্মীয় আশ্রমে। অবসর সময়ে তিনি আশ্রমের বাগানে মটরশুঁটি চাষ করতেন।

Time/Bono_porichoy

কিন্তু মেন্ডেল তো শুধু শখের বশেই বাগান পরিচর্যা করতেন না, এর মধ্যে তার বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যও ছিল। খুবই যত্নের সঙ্গে তিনি মটরগাছগুলোকে নিয়ে গবেষণা চালাতেন। গাছগুলোকে তিনি বলতেন তার বাচ্চা।

এত গাছ রেখে তিনি যে মটরগাছই বেছে নিলেন—এটা ভাগ্যের দারুণ সহায়তা ছাড়া আর কিছু নয়। জিনতত্ত্বের গবেষণায় এর চেয়ে ভালো কিছু কমই আছে। তার কাছে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সুস্থিত প্রজাতির অনেকগুলো মটরগাছ ছিল, যেগুলোর মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে তিনি সহজেই নানা রকম সংকর উৎপাদন করতে পেরেছিলেন।

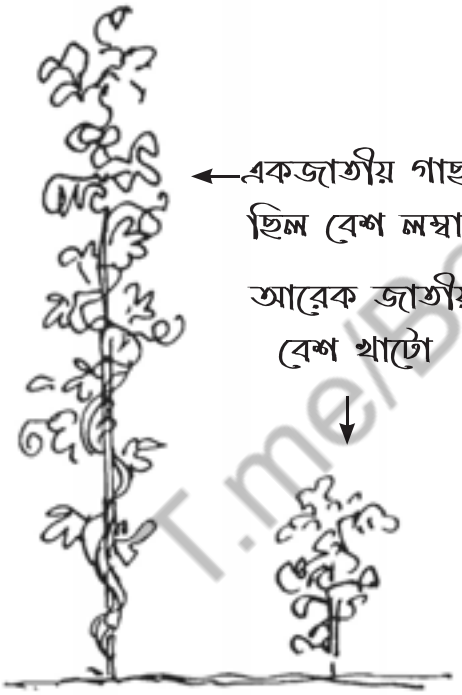

ছিল সবুজ রঙের মটর আবার হলুদ রঙের মটর। বীজের আবরণ ছিল কোনোটার ধূসর, কোনোটার সাদা। ফুল কারও সাদা, কারও বেগুনি। মটরের কাঁচা খোসার রঙে ছিল ভিন্নতা, বীজের অ্যালবুমিনের রং, ফুলের অবস্থান—এসবেও ছিল বৈচিত্র্য।

T.me/Borno_porichoy

মটরগাছের ফুলে পুরুষের অংশ, স্ত্রী অংশ দুটোই থাকে। সুতরাং সাধারণত ফুলগুলো নিজেরা নিজেরাই নিষিক্ত হতে পারে।

মেন্ডেল যেভাবে সংকরায়ন ঘটিয়েছিলেন:

ফুলগুলো একেবারে ছোট থাকার সময়ই এদের পরাগধানি কেটে ফেললেন, যেন নিজে নিজে অর্থাৎ স্বপরাগায়ন ঘটতে না পারে।

এরপর যে ফুল নিয়ে গবেষণা করতে চান সেই 'পিতৃ'-ফুলের পরাগরেণু এনে অপারেশন করা ফুলের গর্ভমুণ্ডে ছুঁয়ে দিলেন।

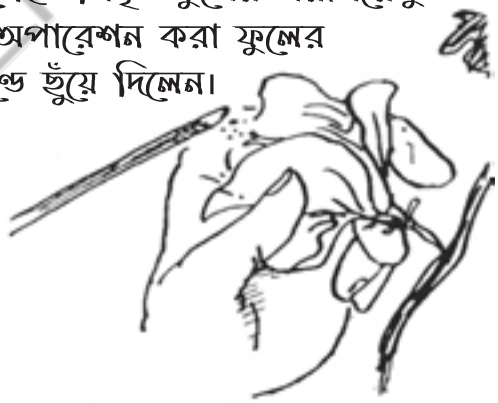

এরপর ওই ফুলটিকে কাপড়ের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিলেন, যেন অন্য কোনো ফুলের পরাগরেণু আর না পড়তে পারে।

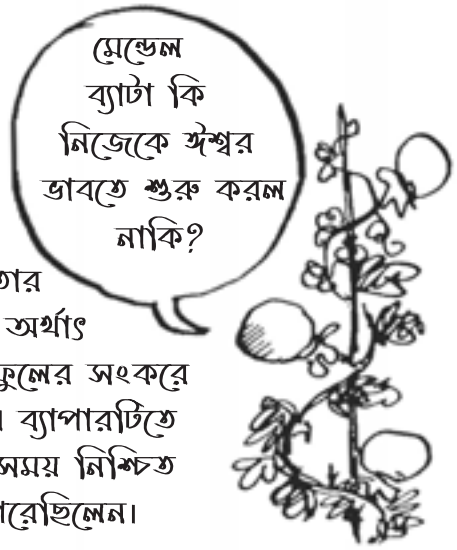

এভাবেই, যে ফলটি জন্ম নেবে, তার বংশপরিচয় অর্থাৎ কোন কোন ফুলের সংকরে তার জন্ম, এ ব্যাপারটিতে মেন্ডেল সব সময় নিশ্চিত থাকতে পেরেছিলেন।

T.me/Boi_Porichoy

মেন্ডেল প্রথমেই যেটা বুঝতে পেরেছিলেন সেটা হলো প্রকট বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব, যেগুলো অন্য বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। মেন্ডেল যখন একটা লম্বা গাছের সঙ্গে একটা খাটো গাছের সংকরায়ন ঘটালেন, কী মনে হয়, কী পেলেন তিনি? কেউ কেউ ভাবতে পারে মাঝারি আকৃতির গাছ পেয়েছিলেন তিনি।

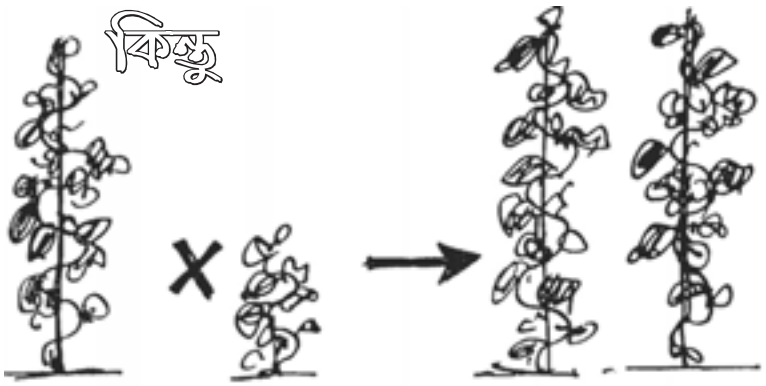

আসলে যা দেখা গেল—

সব সংকরই হয়েছে লম্বা

মেন্ডেল এটাকে এই বলে ব্যাখ্যা করলেন যে, লম্বা হওয়ার ব্যাপারটি খাটো হওয়ার ব্যাপারটির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। লম্বা হওয়াকে তিনি বললেন প্রকট বৈশিষ্ট্য আর খাটো হওয়াটাকে বললেন প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য। সব ক্ষেত্রেই তিনি কোনো না কোনো প্রকট বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেলেন। ও হ্যাঁ, লম্বা হওয়াটা যে প্রকট বৈশিষ্ট্য, সেটা মটরের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, অন্য জীবে কিন্তু না-ও হতে পারে।

কোন ফুল থেকে পরাগরেণু এল আর কোন ফুল থেকে ডিম্বাণু সেটা কোনো ব্যাপার নয়, বিশুদ্ধ জাতের লম্বা-খাটোর সংকর সব সময়ই হয় লম্বা।

এরপরই হলো আসল মজা। সংকরদের মধ্যে যদি প্রজনন ঘটানো যায়, তখন কী হবে?

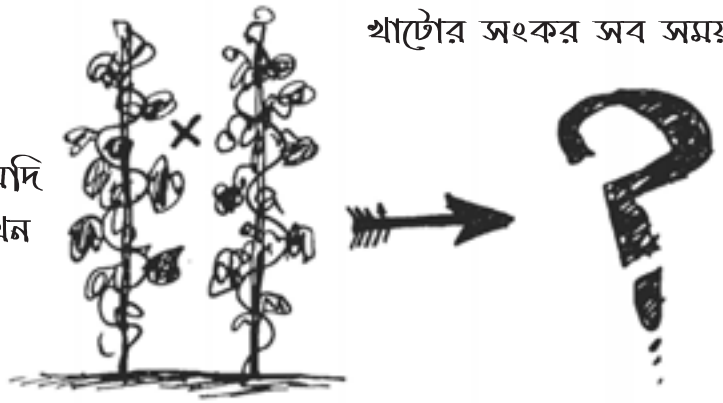

T.me/BanglaBook.org

যখন সংকরগুলোর মধ্যে স্বপরাগায়ন ঘটল অর্থাৎ নিজেরা নিজেরা নিষিক্ত হলো, নতুন প্রজন্মে যাদের পাওয়া গেল তাদের চার ভাগের এক ভাগ হলো খাটো!

মেন্ডেল থামলেন না। এই প্রজন্মকেও তিনি স্বপরাগায়নের সুযোগ দিলেন এবং লক্ষ করলেন

* আগে যে তিন ভাগ লম্বা ছিল, তার এক ভাগ শুধু লম্বা গাছেরই জন্ম দিল।
* আগে যে তিন ভাগ লম্বা ছিল, তার বাকি দুই ভাগ থেকে ৩:১ অনুপাতে লম্বা ও খাটো দুই ধরনের গাছই পাওয়া গেল।
* আগে যে এক ভাগ খাটো ছিল, সেগুলো শুধু খাটো গাছেরই জন্ম দিল।

মেন্ডেলের ব্যাখ্যা:
পরাগরেণুর আর ডিম্বাণুর মধ্যে
কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে,
যেটা গাছটির উচ্চতা
নির্ধারণ করে দেয়, এই
'কিছু একটা'কে
আমরা নাম দিলাম
জিন।

একটি পরাগরেণু আর একটি ডিম্বাণুর প্রতিটি একটি করে উচ্চতার জিন থাকে। সুতরাং এদের থেকে যে গাছটা হবে, তাতে জিন থাকবে দুটি।

কোনো বৈশিষ্ট্যের জিন দুই ধরনের হতে পারে। একেকটা ধরনকে বলে একেকটা অ্যালিল। যেমন উচ্চতার জিনের দুইটা অ্যালিল আছে—

* লম্বা হওয়ার অ্যালিল, *A*
* খাটো হওয়ার অ্যালিল, *a*

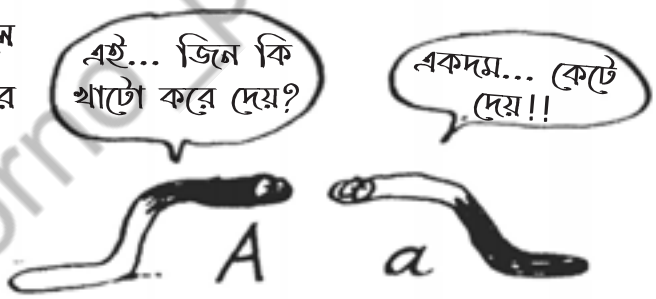

কোনো গাছে যে দুটো অ্যালিল থাকে, সেগুলো একই হতে পারে, আবার আলাদাও হতে পারে।

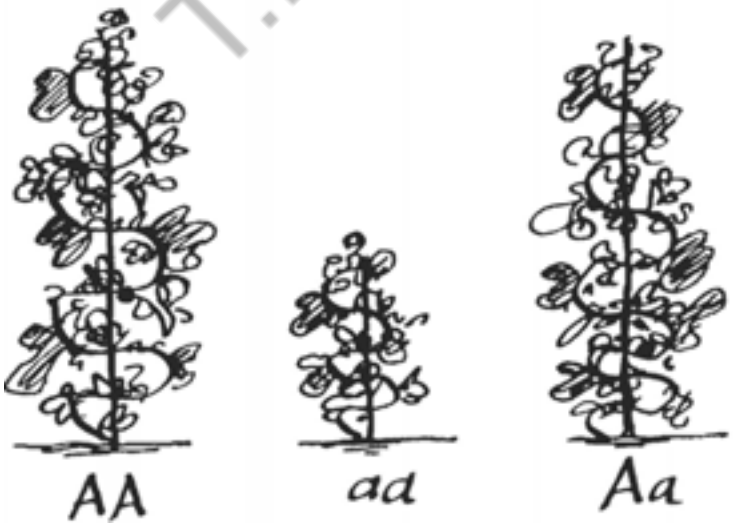

যেহেতু *A* অ্যালিলটি, *a* অ্যালিলের ওপর প্রকট (লম্বা হওয়ার ব্যাপারটা খাটো হওয়ার ওপর প্রভাব বিস্তার করে) *Aa* জিন-ওয়ালা গাছটা হবে লম্বা। অ্যালিলগুলো কখনোই একটার সঙ্গে আরেকটা মিশে যায় না।

T.me/Borno_porichoy

কী হয় যখন *AA*-এর সঙ্গে *AA*-এর সংকরায়ন ঘটে? পরাগরেণু আর ডিম্বাণু প্রত্যেক জিনের একটা করে কপি পায়।

এ ক্ষেত্রে দুটি অ্যালিলই হয় একই-*A*— সুতরাং যে গাছটি পাওয়া যাবে সেটি আবারও হবে *AA* অর্থাৎ লম্বা। ঠিক একইভাবে *aa* থেকে পাওয়া যায় শুধু *aa*। এগুলোই বিশুদ্ধ লম্বা আর বিশুদ্ধ খাটো গাছ।

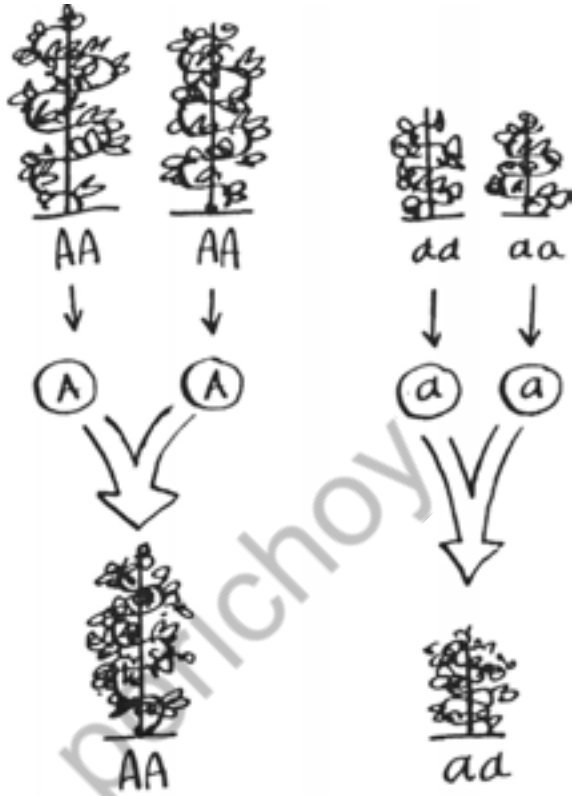

মেন্ডেল প্রথমে সংকর ঘটিয়েছিলেন *AA* ও *aa*-এর মধ্যে। এতে যা ঘটার কথা—

AA থেকে যে পরাগরেণু আসবে সেখানে থাকবে শুধু *A*,
aa থেকে যে ডিম্বাণু আসবে সেখানে থাকবে শুধু *a*।

ফলাফলঃ

Aa আর এটি হলো লম্বা। যদি *AA* থেকে ডিম্বাণুরা আর *aa* থেকে পরাগরেণু আসে তাহলেও একই ঘটনা ঘটবে।

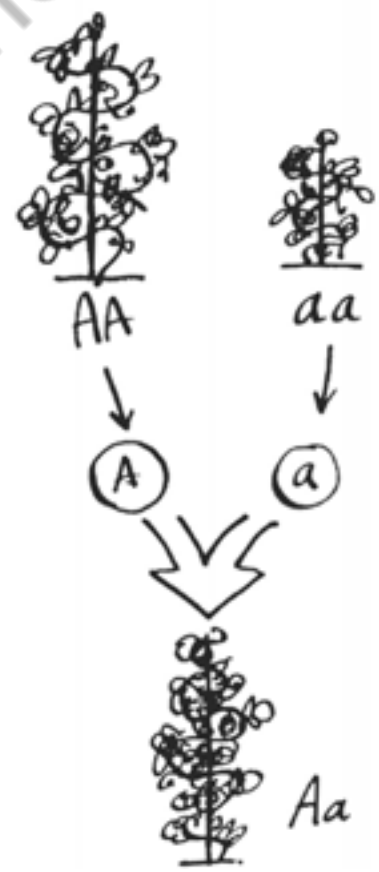

T.me/Borno_Pothchoy

যখন সংকরগুলোর মধ্যে স্বপরাগায়ন ঘটল, সেগুলোর *A* ও *a* অ্যালিলগুলো এলোপাতাড়িভাবে কোনোটা পরাগরেণুতে আর কোনোটা ডিম্বাণুতে চলে গেল। *A* ও *a* দুটো অ্যালিলই পাওয়া গেল এবং প্রায় সমান অনুপাতেই পাওয়া গেল।

T.me/BornoPorichoy

পুরো ব্যাপারটাকে এখানে সংক্ষেপে দেখানো হয়েছে। নতুন প্রজন্ম কত রকমভাবে জন্মাতে পারে, সম্ভাব্য সব উপায় ছোট ছোট বাক্স চারটিতে তাকালেই বোঝা যাবে...

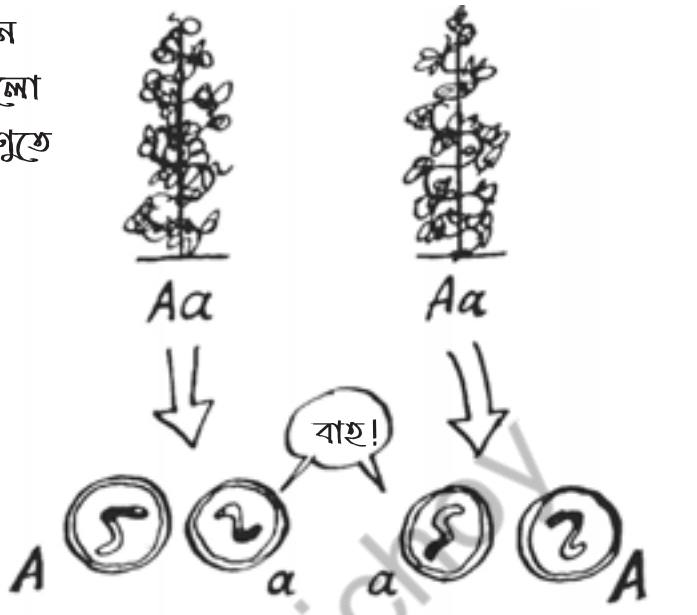

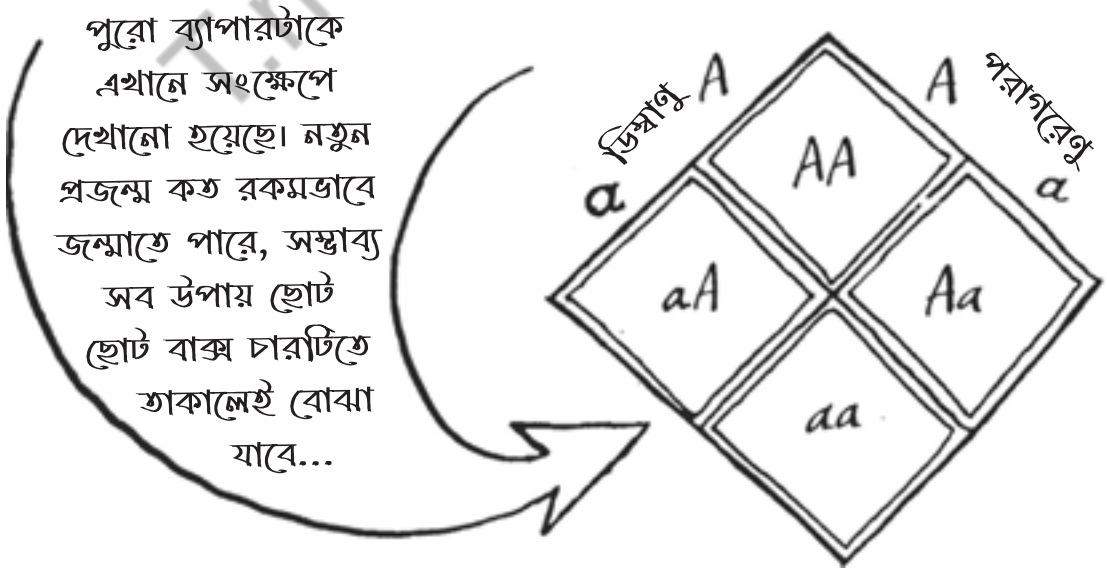

মেন্ডেল যা কিছু পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এখানে সেগুলোকে আরও একবার দেখানো হলো। প্রথম প্রজন্মের ফলাফলটা এই বর্গের ভেতর যেভাবে দেখানো হয়েছে তার সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়।

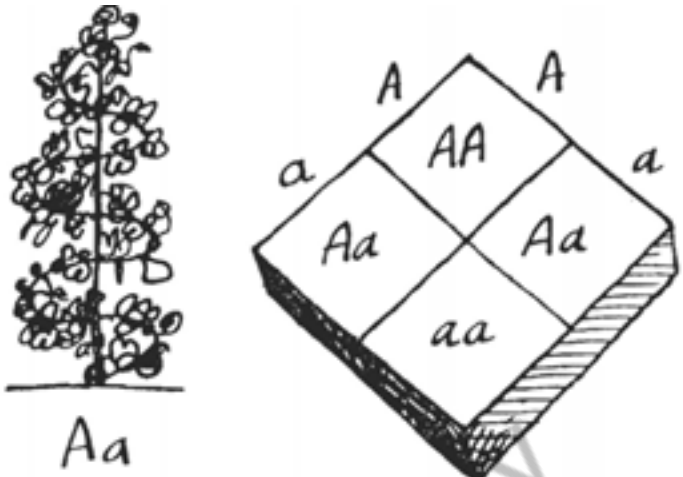

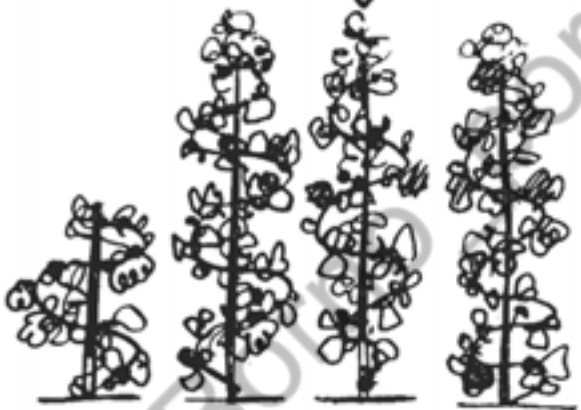

$\frac{1}{4}$ বিশুদ্ধ লম্বা (AA)

$\frac{1}{2}$ লম্বা, কিন্তু বিশুদ্ধ নয় (Aa)। এদের থেকে পরবর্তী সময়ে খাটো গাছ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

$\frac{1}{2}$ বিশুদ্ধ খাটো (aa)

T.me/Boiporichoy

মেন্ডেল অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নিয়েও গবেষণা করলেন— গোল মটরের সঙ্গে কোঁচকানো মটর, সাদা ফুলের সঙ্গে বেগুনি ফুল ইত্যাদি ইত্যাদি। সব ক্ষেত্রেই তিনি লক্ষ করলেন দুটি অ্যালিল বিশিষ্ট কোনো নির্দিষ্ট জিনই একেকটি বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে। এই অ্যালিলগুলোর একটি হয় প্রকট আর অন্যটি প্রচ্ছন্ন।

যেহেতু একটা গাছের অনেক রকম বৈশিষ্ট্য থাকে, সুতরাং মনে হতে পারে যে পরাগরেণু আর ডিম্বাণু এ রকম ছোট ছোট অসংখ্য 'কিছু একটা'য় ভরপুর। আসলেই, মনে হচ্ছে সেখানে চরম গ্যাঞ্জাম!

জিনকে কখনো চোখে না দেখেই মেন্ডেল ঘোষণা করলেন— পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্যগুলো সন্তানের মধ্যে কীভাবে সঞ্চারিত হবে, তা নিয়ন্ত্রণ করে বংশগতির অণু (*atoms of heritance*)। এগুলো কখনো ধ্বংস হয় না বা কোনোটার সঙ্গে কোনোটা মিশেও যায় না, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে তাদের বৈশিষ্ট্য অটুট রেখে বয়ে চলে।

t.me/BanglaBook.org

অবশেষে, মেন্ডেল এমন সব গাছের মধ্যে সংকরায়ন ঘটালেন, যাদের মধ্যে আলাদাভাবে দুটি বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য রয়েছে। যেমন মসৃণ বীজওয়ালা লম্বা গাছ আর কোঁচকানো বীজওয়ালা খাটো গাছ। মেন্ডেলের মনে যেটা প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে গাছের উচ্চতা আর বীজের মসৃণতা—এদের কোনোটা কি অন্যটার ওপর নির্ভর করে? নাকি এরা পুরোপুরি স্বাধীনভাবে এদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে যায়?

ধরা যাক, মসৃণ বীজের অ্যালিল হলো *S* আর কোঁচকানোটার অ্যালিল *s*। যেহেতু *S* এখানে প্রকট...

AASS ও *aass*-এর মধ্যে সংকর ঘটালে যা পাওয়া গেল—

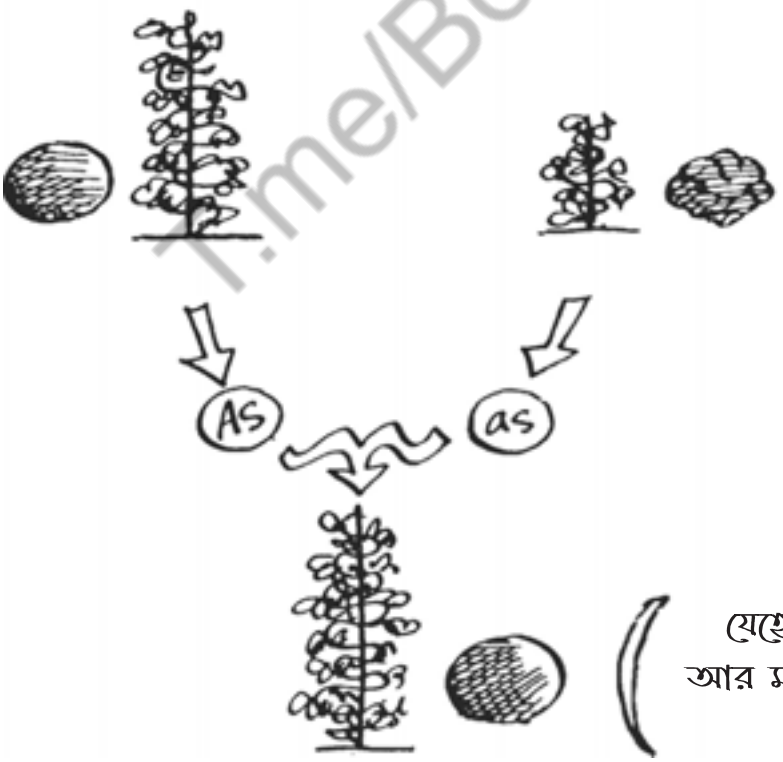

যেহেতু লম্বা হওয়া আর মসৃণ হওয়া প্রকট বৈশিষ্ট্য।

T.me/Borno_porichoy

এখন সংকরগুলো নিজেরা নিজেরা নিষিক্ত হলে যে প্রজন্ম পাওয়া যাবে, সেখানে—

যদি উচ্চতার জিন আর মসৃণতার জিন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে সবগুলো পরাগরেণু আর ডিম্বাণু এ রকম হবে।

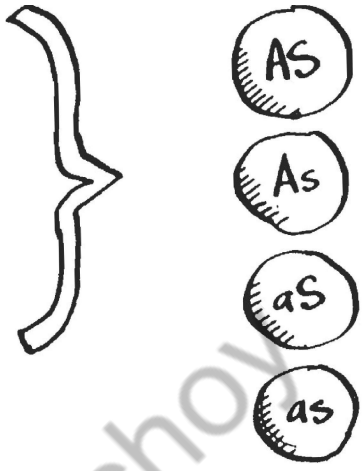

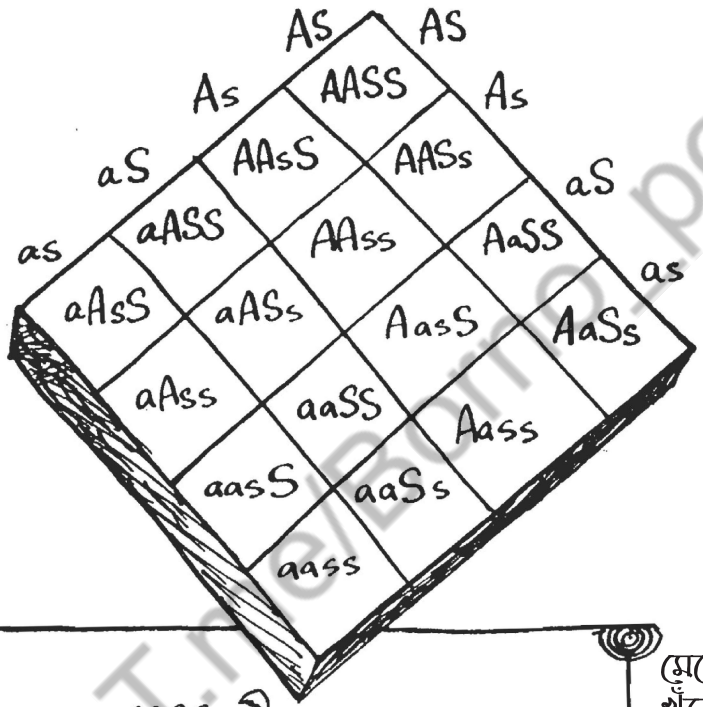

সে ক্ষেত্রে সংকরায়নের তালিকাটা হবে এ রকম

AASS, AASs, AaSS, AaSs — 9 লম্বা, মসৃণ

AAss, Aass — 3 লম্বা, কোঁচকানো

aaSS, aaSs — 3 খাটো, মসৃণ

aass — 1 খাটো, কোঁচকানো

মেন্ডেল ঠিক এই অনুপাতটাই খুঁজে পেলেন পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে— *9:3:3:1*. অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করেও তিনি একই ফলাফল পেলেন। এটা প্রমাণ করল স্বাধীনভাবে বিন্যস্ততার সূত্র (*law of inde-pendent assortment*) যেটা বলে, আলাদা জিনের অ্যালিলগুলো আলাদাভাবেই বা স্বাধীনভাবেই কাজ করে। (আমরা কিছু পরেই দেখতে পাব এই সূত্র আসলে পুরোপুরি ঠিক না!)

T.me/Boi_porichoy

তো, এখন আমরা জানি জিনগুলো কীভাবে কাজ করে। এখন যদি কারও খুব ইচ্ছা করে কোনো জিনতত্ত্বের কথাবার্তায় আড়ি পাততে, তার সুবিধার্থে কিছু পারিভাষিক শব্দ শিখিয়ে দেওয়া যাক।

জিনতত্ত্ববিদরা প্রায়ই দুটি শব্দকে গুরুত্বের সঙ্গে আলাদা করে বলেন—

i. ফিনোটাইপ— জীবটি বাহ্যিকভাবে দেখতে কেমন।

ii. জিনোটাইপ— এর মধ্যে কী কী অ্যালিল রয়েছে।

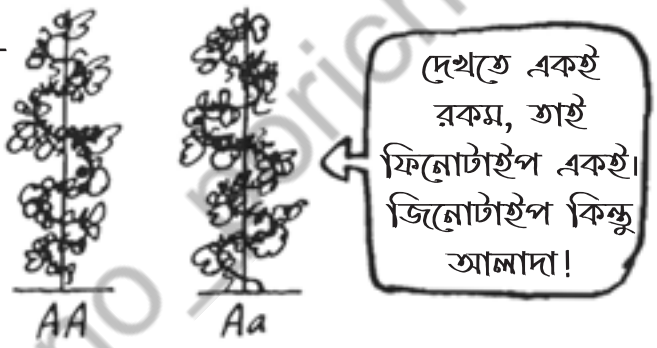

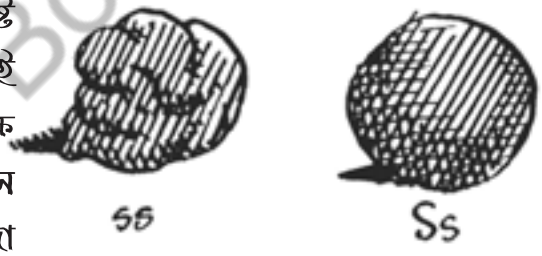

কোনো জীবে, কোনো নির্দিষ্ট জিনের দুটি অ্যালিল যদি একই হয়, তখন ওই জিনের সাপেক্ষে জীবটিকে বলে হোমোজাইগাস আর অ্যালিল দুটি আলাদা হলে বলে, হেটারোজাইগাস

এখন, যদি কোনো জিনতত্ত্ববিদ বলেন, জীবটির 'ফিনোটাইপ মসৃণ আর জিনোটাইপ হেটারোজাইগাস' তিনি আসলে কী বোঝাতে চাইছেন এটা আশা করি এখন আমরা বুঝব।

T.me/Borno_Porichoy

হ্যাঁ, আমরা এখন এমন একটা অবস্থানে পৌঁছেছি যে জ্যাকবের পশুগুলোর গায়ে সাদা ছোপ-ছোপ দাগ আসার রহস্য আমরা বুঝতে পারব।

কালো চামড়ার জন্য যে অ্যালিল ধরা যাক সেটার নাম *B*. এই অ্যালিলটিই ছিল প্রকট। আর সাদা ছোপের জন্য যে অ্যালিল ধরা যাক সেটির নাম *w*. এটা ছিল প্রচ্ছন্ন।*

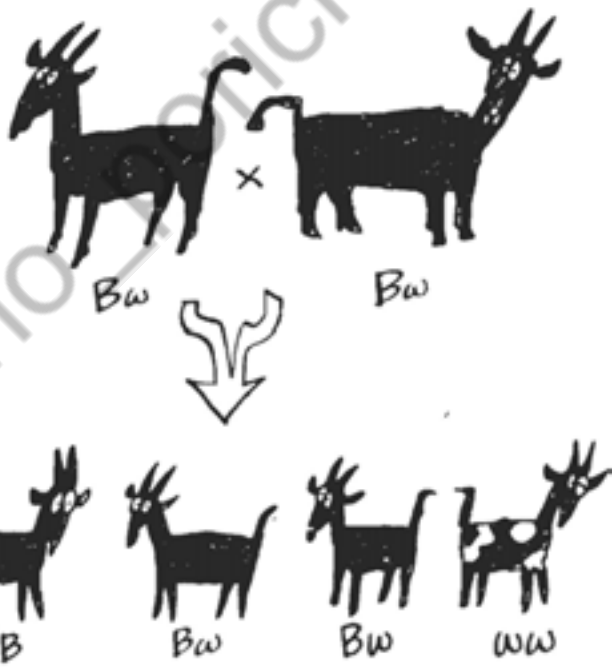

লাবানের ফিনোটাইপিকালি কালো দেখতে যেই পশুগুলো ছিল, তাদের কয়েকটির ভেতর ছিল এই প্রচ্ছন্ন অ্যালিল *w*. সুতরাং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাদা ছোপওয়ালা পশু জন্ম নেওয়াটা খুব অস্বাভাবিক না!

অন্যভাবে বলতে গেলে—

* প্রকৃতপক্ষে, চামড়ার রং কেমন করে নির্ধারিত হয়, তার জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাটা বেশ জটিল। তারপরও মূল ঘটনার নায়ক ছিল ওই প্রচ্ছন্ন জিনই।

T.me/Borno_Porichoy

প্রশ্নঃ

কোনো প্রকট ফিনোটাইপ দেখলে আমরা কীভাবে বুঝব এটা হেটারোজাইগোট নাকি হোমোজাইগোট?

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মানুষের ক্ষেত্রে নীল চোখের ওপর বাদামি চোখ প্রভাববিস্তারকারী। এখন বাদামি চোখের জিনকে যদি আমরা *B* দিয়ে আর নীল চোখের জিনকে যদি *b* প্রকাশ করি, প্রশ্ন এসেই যায়—

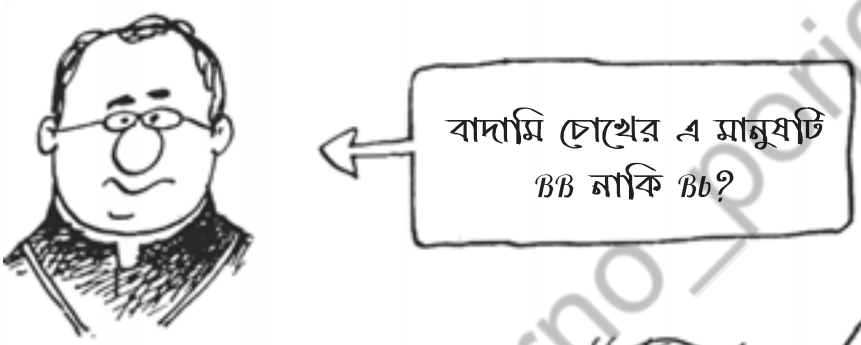

একটা বুদ্ধি হচ্ছে কোনো প্রচ্ছন্ন হোমোজাইগোট অর্থাৎ নীল চোখের কোনো মানুষের সঙ্গে তার প্রজনন ঘটানো!

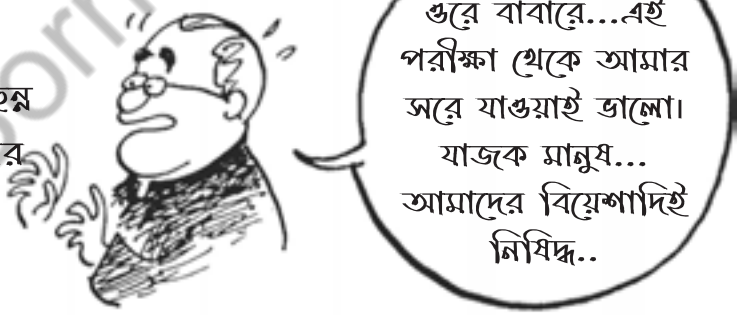

বাদামি চোখের কোনো লোকের সঙ্গে নীল চোখের কোনো মহিলার বিয়ে হওয়ার পর,

যদি সন্তানদের কোনো একজনের চোখ হয় নীল, তাহলে নিঃসন্দেহে বাদামি চোখের লোকটি ছিল হেটারোজাইগোট *Bb*. কেননা *BB* হলে সবগুলো সন্তানই হতো *Bb*, বাদামি চোখের।

T.me/Borno_porichoy

উদাহরণস্বরূপ, আমার প্রথম বউয়ের চোখ ছিল বাদামি [প্রিয় পাঠক! এগুলো কিন্তু মূল লেখকের কথা, এই অভাগা অনুবাদকের নয়!] আমাদের এক ছেলের চোখ হলো নীল। তার মানে আমার প্রথম স্ত্রী নিশ্চয়ই ছিল হেটারোজাইগাস। নীল চোখের ছেলেটির একটা অ্যালিল এসেছিল মায়ের কাছ থেকে। কেউ চাইলে সংকরের ছকটা আবার তৈরি করে দেখতে পারো।

আমার দ্বিতীয় স্ত্রীর চোখ আমার মতোই নীল। এখন যদি কোনো সন্তানের চোখের রং বাদামি হয়, তখন কী হবে? যেই শয়তানটা বাড়িতে দুধ দিতে আসে তাকে জিজ্ঞেস করাই ভালো!

sport? হ্যাঁ, সন্তান যদি বাবা-মা কারও মতো না হয়, তখন ওই সন্তানকে বলে sport। তাই তো, এটা তো sport-ও হতে পারে। ওহ্ হো, আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

T.me/Borno_Library

T.me/BornToporichoy

যদি বাবা-মা দুজনার মধ্যেই কোনো জটিল রোগের প্রচ্ছন্ন জিন লুকিয়ে থাকে, তাহলে সন্তান সেই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে যায়। এ ধরনের রোগের মধ্যে আছে হিমোফিলিয়া, সিক্‌ল-সেল এনিমিয়া, টে-স্যাকস, সিনড্রোম, থ্যালাসেমিয়া, বামনত্ব ইত্যাদি...

১. বংশগতির বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে জিন। জিনগুলো সংকরের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগুলোকে অক্ষুণ্ণভাবে বয়ে নিয়ে যায় এবং একটা জিনের সঙ্গে আরেকটা কখনো মিশে যায় না।

২. একধরনের জিন (অ্যালিল) আরেকটার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। দুর্বল জিনটাও কিন্তু হারিয়ে যায় না, সুযোগমতো পরে ঠিক ফিরে আসে।

৩. প্রতিটি পূর্ণবয়স্ক জীবের শরীরের কোষে দুই কপি করে থাকে প্রতিটা জিন, যার এক কপি সে পেয়েছে বাবার থেকে আরেক কপি মায়ের থেকে। এরপর যখন শুক্রাণু কিংবা ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়, এরা প্রত্যেকে এক কপি করে পায়।

৪. শুক্রাণু ও ডিম্বাণুতে যখন একটা করে অ্যালিল ঢুকে পড়ে, যার যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে—একটি জিনের অ্যালিল অন্য জিনের অ্যালিলের কাজে প্রভাব রাখে না। অ্যালিলের সবগুলো বিন্যাস হুবহু একই না হলেও সমান দৈর্ঘ্যের এবং একই রকম।

পরে গিয়ে আমরা দেখব, মেন্ডেল যা যা বলেছিলেন তার সবগুলো কথাই পুরোপুরি সত্যি না! প্রকট জিন মাঝে মাঝে তার প্রভাব বিস্তারের কাজে আংশিকভাবে সফল হয়...কিছু কিছু জীব রয়েছে যাদের জিন থাকে মাত্র এক সেট...আবার কিছু কিছু জীব আছে, দুই সেটের জায়গায় তাদের চার সেট জিন থাকে। আর...স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হওয়ার যে সূত্র মেন্ডেল দিয়েছিলেন তার ব্যতিক্রমগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ!

মেন্ডেল তার তত্ত্বকে ১৮৬৫ সালে পাঠিয়ে দিলেন ব্রুন ন্যাচারাল সায়েন্স সোসাইটিতে। তারা কোনো আমলেই নিলেন না তত্ত্বটাকে — এটা দেখেই যেন তাদের ঘুম পেয়ে গেল...

দুঃখের বিষয়টা হলো, এ বিষয়টা নিয়েই আর কেউ মাথা ঘামাতে চাইলেন না— ওসব পুরোনো আমলের সমস্যা নিয়ে ভেবে কী হবে? আর তা ছাড়া ১৮৫৯ সালে বিবর্তনবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে বিজ্ঞানীরা এটা নিয়েই এত বেশি মেতে রইলেন যে কোথাকার কোন মেন্ডেল কিসের কী সূত্র দিল, সেটা নিয়ে ভাবার সময় কারও ছিল না।

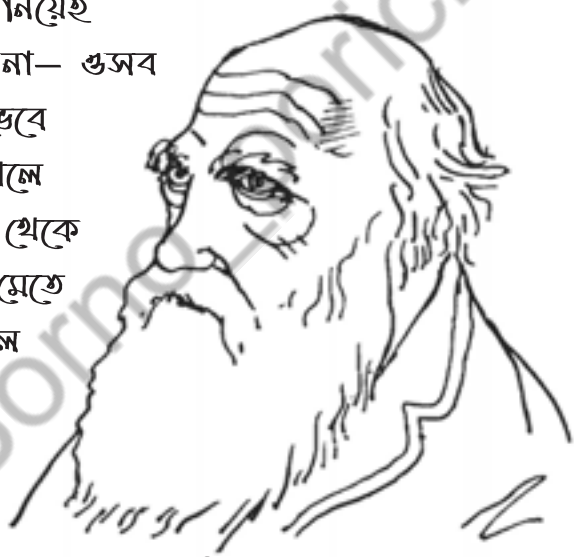

মেন্ডেল যখন মৃত্যুবরণ করেন, তত দিনে বিজ্ঞানী মহল তার কাজগুলোকে পুরোপুরিই ভুলে গেছে। কিন্তু ১৮৮৪ সালে মৃত্যুর কিছুদিন আগেই মেন্ডেল বলেছিলেন, 'আমারও দিন আসবে...'

T.me/Borno-Porichoy

এবার তুমি ওদেরে দেখতে পাবে

মেন্ডেলের গবেষণা যখন অযত্নে-অবহেলায় পড়ে ছিল, অন্যরা তখন ব্যস্ত ছিলেন ক্ষুদ্রদের জগতে অসাধারণ সব জিনিস খুঁজে পেতে।

এখন তো আমরা ধরেই নিই যে সব জীবিত বস্তুই কোষ দিয়ে তৈরি। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্তও মানুষ এই বিষয়টাকে পুরোপুরি মেনে নেয়নি।

সেই কত দিন আগে, সতেরো শতকে রবার্ট হুক (১৬৩৫-১৭০৩) দেখতে পেয়েছিলেন কর্কের কোষীয় গঠন। এরপর ১৮০০ সালের দিকে যখন আরও ভালো ভালো অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হলো, বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন আমাদের সবার শরীরেই অমন ছোট্ট ছোট্ট ঘর আছে।

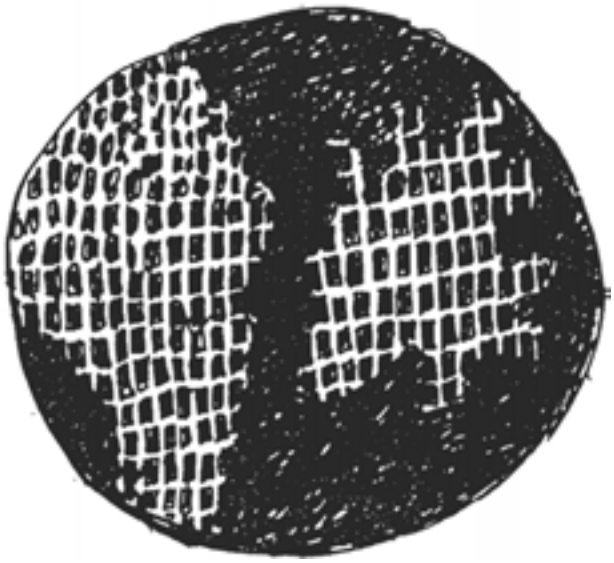

মানুষের শরীরে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন কোষ থাকে (১ ট্রিলিয়ন মানে ১ লক্ষটা ১ কোটি!)। আবার প্রোটোজোয়ার মতো জীবের দেহে কোষ থাকে মাত্র একটা। আকার এবং চেহারায় কোষ বহু রকমের হতে পারে।

তার ওপর দেখা গেল, প্রতিটি কোষই আগেকার কোনো কোষ ভেঙে তৈরি হয়। এই ভেঙে যাওয়া বা **'বিভাজন'** এর আগে কোষের ভেতরে যা কিছু ছিল সবকিছু দুইটা দুইটা করে হয়ে যায়।

BanglaBook.org

অণুবীক্ষণ যন্ত্র যখন আরও উন্নত হলো, মানুষ দেখতে চাইল কোষের ভেতর কী আছে।

সবার আগে তারা দেখল, কোষের মধ্যে আছে নিউক্লিয়াস। আর নিউক্লিয়াসের মধ্যে কিছু জিনিস আছে যেগুলো খুবই অদ্ভুত দেখতে।

তারা দেখল— কোষ ভেঙে যাওয়ার ঠিক আগে আগে কোত্থেকে জানি সুতার মতো ছোট ছোট কিছু বস্তুর উদয় হলো, এগুলো দ্বিগুণ হলো, তারপর আবার হাওয়া!

এদের নাম দেওয়া হলো ক্রোমোজোম। আবিষ্কারের পর থেকেই নানা রকম বিতর্কের জন্ম দিতে লাগল এরা।

শেষ পর্যন্ত সবাই মেনে নিল যে, আসলে ক্রোমোজোমগুলো কখনোই পুরোপুরি মিলিয়ে যায় না বা মিশে যায় না। অধিকাংশ সময়ে এরা এত চিকন থাকে যে, প্রচলিত অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে তখন এদের দেখা যায় না। কোষ বিভাজনের সময় সেগুলো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে মোটা হয়ে যায় আর শুধু তখনই এদের দেখা সম্ভব হয়।

নিবিড় অনুসন্ধানের পর বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন কোষ ভেঙে যাওয়ার সময় ক্রোমোজোমগুলোর ভাগ্যে আসলে কী কী ঘটে।

প্রথমে— অদৃশ্য অবস্থাতেই একটা ক্রোমোজোম থেকে তারই মতো আরেকটা ক্রোমোজোম তৈরি হয়। এরা দুজনে সেন্ট্রোমিয়ার বলে এক জায়গায় লেগে থাকে।

এরপর তারা পেঁচিয়ে খাটো ও মোটা হয়। তখন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায়।

নিউক্লিয়াসের বাইরের পর্দা মিলিয়ে যায়। এক কোনা থেকে আরেক কোনা পর্যন্ত তাঁতিদের সুতাকাটার যন্ত্রে যেমন থাকে, তেমন স্পিন্ডল তন্তু দেখা যায়। ক্রোমোজোমগুলো এই তন্তুগুলোর ওপর সেন্ট্রোমিয়ার রেখে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে যায়!

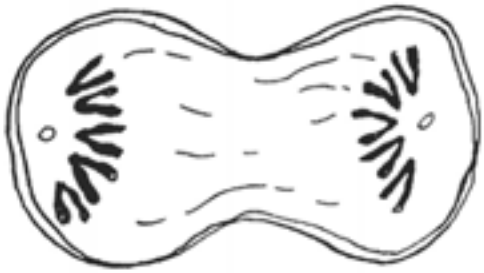

স্পিন্ডল তন্তু বরাবর হ্যাঁচকা টান খেয়ে সেন্ট্রোমিয়ার বেচারি ভেঙে যায়, ফলে ক্রোমোজোমগুলো দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ভাগ হয়ে যাওয়া দুই দল দুই কোনার দিকে সরে যেতে থাকে।

একসময় ক্রোমোজোমগুলো দুই কোনায় অর্থাৎ দুই বিপরীত মেরুতে গিয়ে পৌঁছায়। স্পিন্ডল তন্তুগুলো মিলিয়ে যায়।

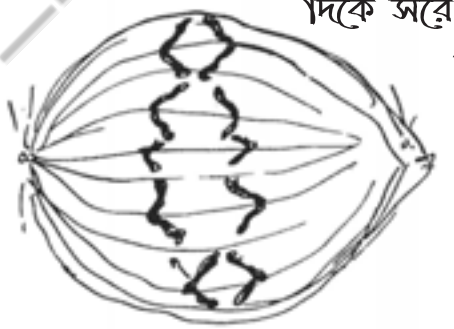

নিউক্লিয়াসের বাইরের পর্দা (NUCLEAR MEMBRANE) আবার ফিরে আসে। ক্রোমোজোমগুলোর প্যাঁচ খুলে সেগুলো আবার অদৃশ্য হয়ে যায় এবং... কোষ বিভাজন সম্পন্ন হয়।

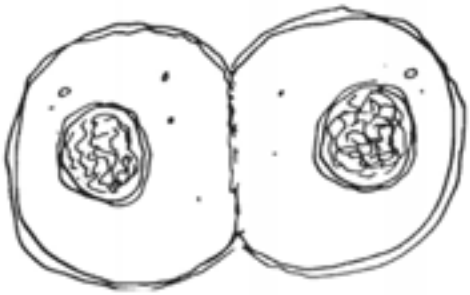

এই পুরো প্রক্রিয়াকে বলে মাইটোসিস (*Mitosis*).

মাইটোসিসের এই পুরো প্রক্রিয়া খুবই নিখুঁত একটি ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা নিশ্চিত করে- কোষ ভেঙে যে নতুন কোষগুলো তৈরি হবে, তাদের মধ্যে মূল কোষের মতোই হুবহু এক রকম এক সেট ক্রোমোজোম থাকবে। আরও স্পষ্টভাবে বললে, তাদের প্রত্যেকের মধ্যে ক্রোমোজোমের সংখ্যা মূল কোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যার সমান হবে। প্রতিটি প্রজাতিরই তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যসূচক ক্রোমোজোমের সংখ্যা রয়েছে।

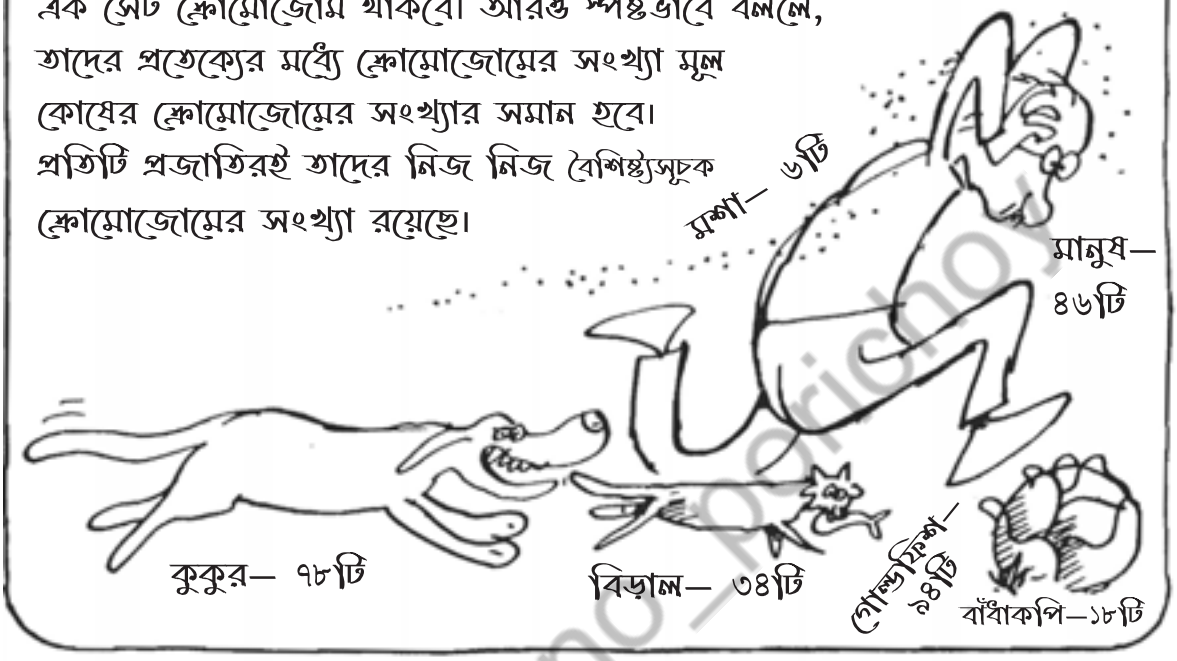

একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে সবগুলো সংখ্যাই জোড়। এর পেছনে একটি সুন্দর কারণ রয়েছে। আর সেটি হলো— ক্রোমোজোম নিজেই আসলে বংশগতি রক্ষার সেই ধারক।

Time/Borno_Parichoy

আসল

ঘটনা

হলো:

শুক্রাণু আর ডিম্বাণু হলো একক কোষ, যার মধ্যে শরীরের সাধারণ কোষের অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে।

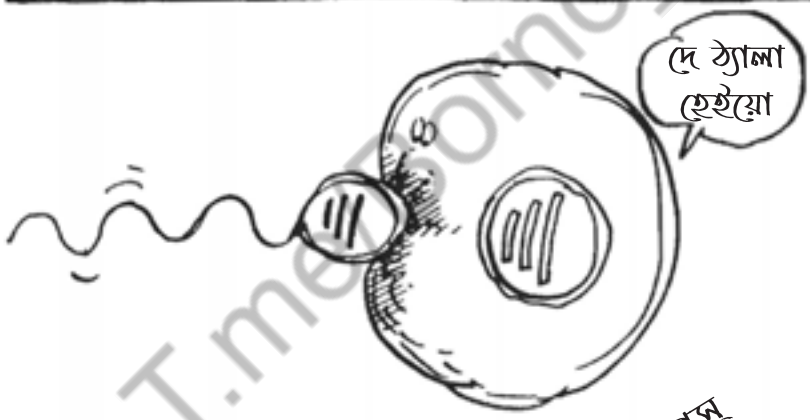

যেভাবে ঘটে ব্যাপারটি: শুক্রাণু আর ডিম্বাণু এই দুই জনন কোষ যারা গ্যামেট বলে পরিচিত— এরা অর্ধেক অর্ধেক সেট ক্রোমোজোম বহন করে।

নিষেকের সময় তাদের নিউক্লিয়াসের দুটো একসঙ্গে মিলে গিয়ে নিষিক্ত ডিম্বাণু বা জাইগোট তৈরি করে। জাইগোটের মধ্যে পুরো এক সেট ক্রোমোজোম থাকে। পরে সেই জাইগোট কোষটিই মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ভেঙে ভেঙে অন্য সব কোষ তৈরি করে।

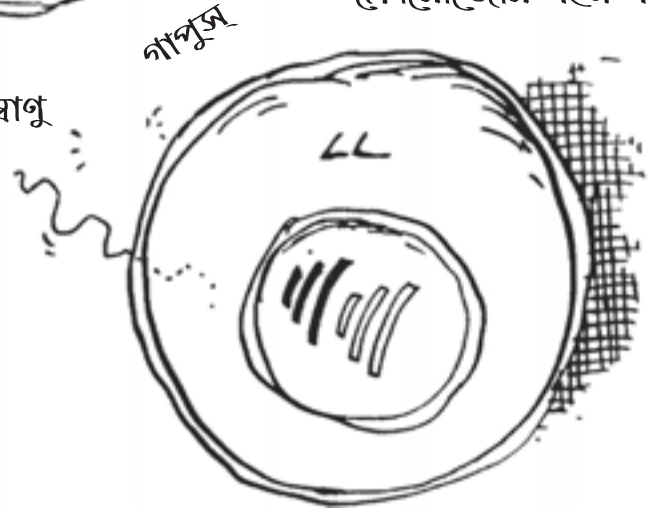

T.me/Porno_porichoy

তার ওপর ১৯০২ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী উইলিয়াম সাটন আবিষ্কার করেন যে শুক্রাণু থেকে পাওয়া প্রতিটি ক্রোমোজোমের সঙ্গে ডিম্বাণুর ভেতরে থাকা একটি করে ক্রোমোজোমের দারুণ মিল রয়েছে। এরা যেন একে অপরের জন্যই তৈরি। ঠিক একই রকম। (এদের সহজে দেখা যায় যখন এরা দ্বিগুণ হয়ে সংকুচিত হয়)

এভাবেই কোষের মধ্যে প্রতিটি ক্রোমোজোমের ঠিক দুটি করে কপি আমরা পেয়ে যাই। এদের বলে **হোমোলোগাস জোড়া** (*Homologous pairs*)। হোমোলোগাস মানে হলো 'একই আকৃতির'।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা যখন বলি, মানুষের শরীরে ৪৬টি ক্রোমোজোম রয়েছে, আসলে সেখানে ২৩টি হোমোলোগাস জোড়া রয়েছে। প্রতিটি জোড়ার একটি আসে বাবার কাছ থেকে আর আরেকটি মায়ের থেকে।

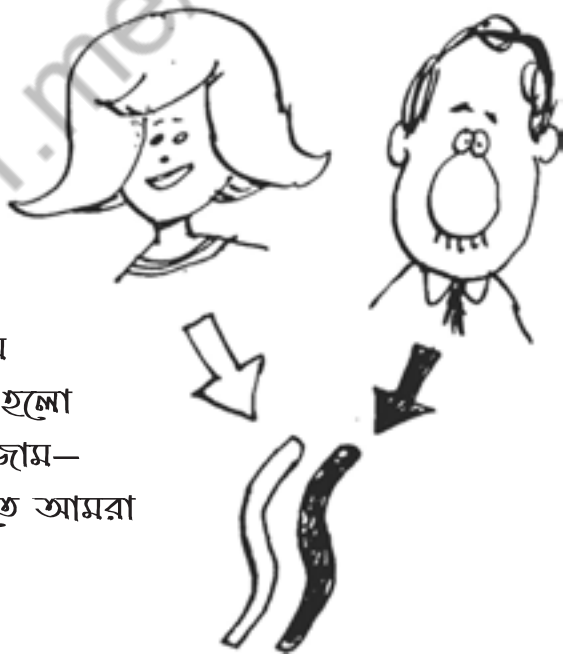

মাইটোসিস থেকে তো আর অর্ধেক সেট ক্রোমোজোম পাওয়া যাবে না। এটা থেকে ধারণা করা যায় শুধু গ্যামেট তৈরির জন্য নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ ধরনের কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া রয়েছে।

* একটি ব্যতিক্রম আছে— সেটি হলো সেক্স ক্রোমোজোম— ওই ব্যাপারটিতে আমরা পরে আসব।

T.me/Borno_porichoy

এই বিভাজন প্রক্রিয়াকে বলে মিয়োসিস (*Meiosis*)। এটা আসলে দ্বিগুণ বিভাজন!

প্রথমে মাইটোসিসের মতোই ক্রোমোজোমগুলো সংখ্যায় দ্বিগুণ হয় ও মোটা হয়।

কিন্তু তারপরই হোমোলোগাস ক্রোমোজোমগুলো কোনো একটা উপায়ে জোড়া বাঁধে।

আবার সেই স্পিন্ডল তন্তু তৈরি হয় এবং চার খণ্ড করে করে ক্রোমোজোমগুলো এক সারিতে অবস্থান নেয়। এদের বলে টেট্রাড (*Tetrads*) এদের কথা পরে আবার বলা হবে।

এবার জোড়াগুলো আলাদা হয়ে যায়। মাইটোসিসের সঙ্গে পার্থক্যটা লক্ষণীয়।

যখন তারা দুই মেরুতে পৌঁছে যায়, স্পিন্ডল তন্তু উধাও হয়ে যায়। তারপর আবার অন্য দিক থেকে আড়াআড়িভাবে স্পিন্ডল তন্তু তৈরি হয়।

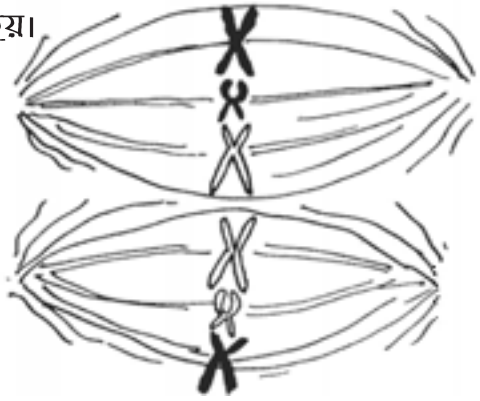

এরপর মাইটোসিস যেমন হয়েছিল তেমন করে ক্রোমোজোমগুলো আলাদা হয়ে যায়...

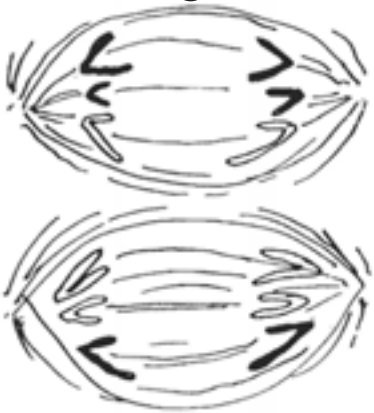

T.me/Boi_Porichoy

মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে এভাবে চারটি কোষ তৈরি হয়, যাদের প্রত্যেকের মধ্যে মূল কোষের অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। যেমন আমাদের এই ছবিতে আমরা দেখি ৬টা থেকে ক্রোমোজোম সংখ্যা ৩টি হয়ে গেছে।

আমরা একটু খেয়াল করলেই দেখব, ক্রোমোজোমের কোন কপিটি (হোমোলোগাস) কোন কোষে যাবে, তা কোনোমতেই বোঝা যায় না। ওপরে যে ছবিটি আমরা দেখেছি তার বদলে নিচের যেকোনো একটিও হতে পারত।

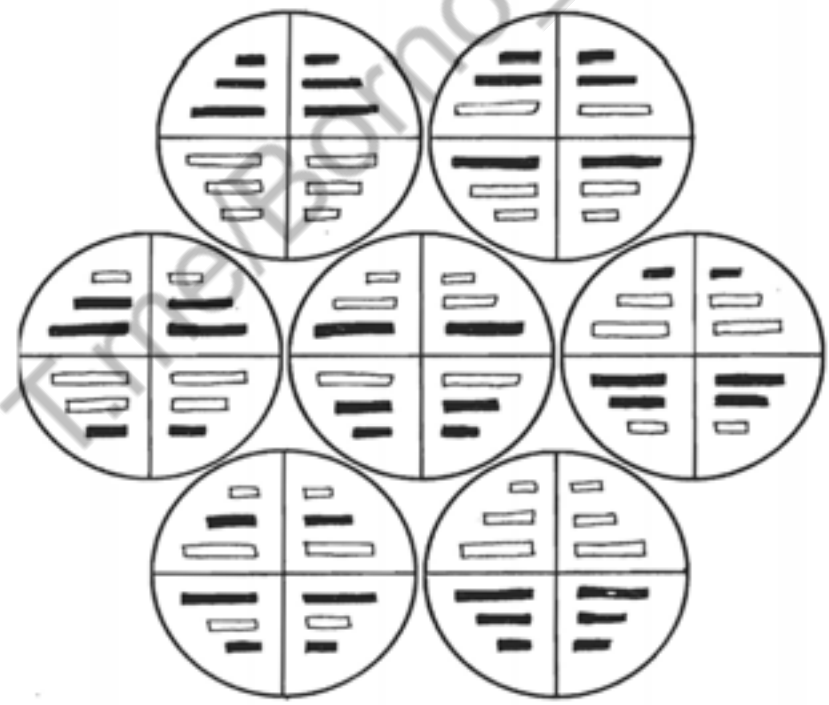

অর্থাৎ আমরা দেখি, ক্রোমোজোমগুলো মেন্ডেলের সেই স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হওয়ার সূত্র মেনে চলছে!

Time/Borno_porichoy

যখনই মাইটোসিস আর মিয়োসিস আবিষ্কৃত হলো, জীববিজ্ঞানীরা সন্দেহ করতে শুরু করলেন—তবে কি ক্রোমোজোমই বংশগতিকে নিয়ন্ত্রণ করে? তারা আবার মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করলেন বংশগতির প্যাটার্নের দিকে এবং বিজ্ঞান আবার এগিয়ে চলল পেছনের দিকে! ফিরে গেল মেন্ডেলের স্বপ্নের কাছে!

উনিশ শতকের শেষের দিকে তিনজন বিজ্ঞানী আলাদাভাবে মেন্ডেলের করা পরীক্ষাগুলো আরেকবার করে দেখেন এবং তারাও মোটামুটি একই রকম ফলাফল পান। তারা ছিলেন—

১৯০০ সালে এই তিন বিজ্ঞানীই লাইব্রেরি ঘাঁটতে গেলেন যে তারা যে গবেষণা করছেন, সেটা নিয়ে আগে কেউ ভেবেছে কি না। সবাই দুঃখের সঙ্গে দেখলেন গ্রেগর মেন্ডেল আগেই সব গবেষণা সেরে রেখেছেন!

ডেভ্রিস, করেন্স আর শেরমার্ক কষ্টে, দুঃখে কিছুদিন চুল ছেঁড়াছেঁড়ি করলেন, একে অন্যের পশ্চাৎদেশে লাথি হানলেন! তারপর পৃথিবীর কাছে প্রকাশ করলেন মেন্ডেলের আবিষ্কারের কথা। দুই বছরের মধ্যে উইলিয়াম সাটন ঘাসফড়িংয়ের কোষের ভেতর হোমো-লোগাস ক্রোমোজোম আবিষ্কার করলেন এবং বিজ্ঞান দেখতে পেল আলোর মুখ!

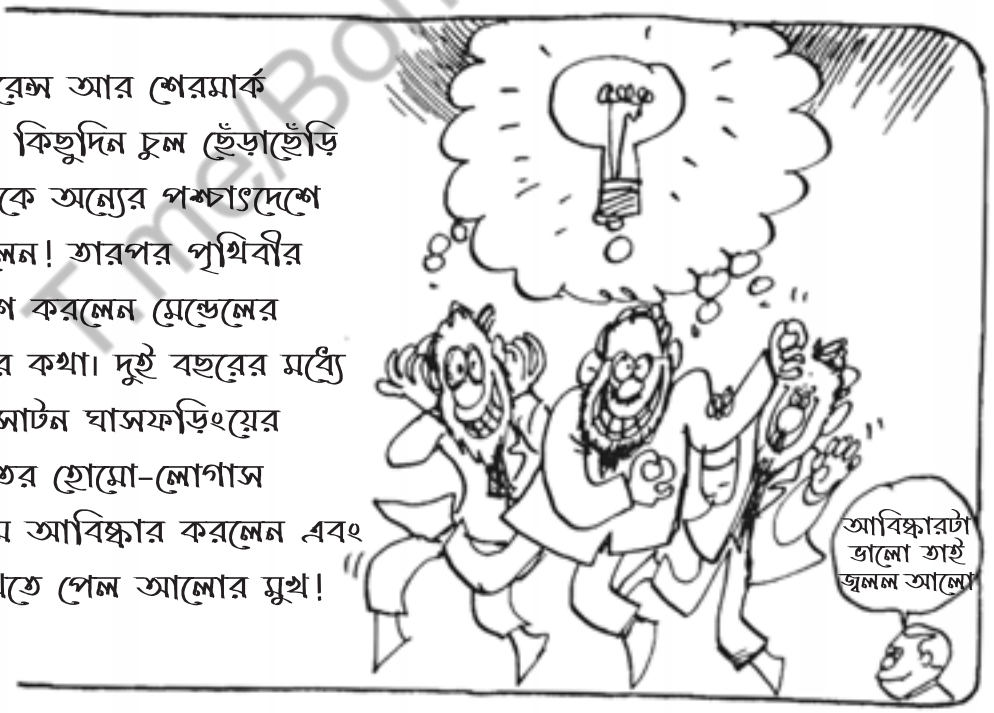

T.me/BorneJonichoy

সংক্ষেপে বলা যাক:

তারা ঠিক কী কী বুঝতে পারলেন?

ক্রোমোজোমগুলোর আচরণ জিনের মতো। সন্তান বা সংকরের মধ্যে এরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখে এবং জনন কোষ তৈরি হওয়ার সময়ে এরা স্বাধীনভাবে আলাদা হয়ে যায়। সুতরাং এটা ভেবে নেওয়া যেতেই পারে যে জিনগুলো ক্রোমোজোমের ভেতরেই থাকে (নিশ্চয়ই প্রতিটা ক্রোমোজোমে অনেকগুলো করে জিন থাকবে মাত্র কয়েক জোড়া কিংবা কয়েক ডজন, আর সেখানে কোনো প্রাণীর প্রতিটা শারীরিক বৈশিষ্ট্যের জন্য একটি করে জিন চিন্তা করলে, জিন নিশ্চয়ই থাকবে অনেক অনেক বেশি।)

হোমোলোগাস জোড়া যখন আবিষ্কৃত হলো, দেখা গেল সেটি মেন্ডেলের সিদ্ধান্তগুলোকে দারুণভাবে সমর্থন করে। মনে আছে তো, তিনি বলেছিলেন প্রতিটা কোষে প্রতিটা জিনের একজোড়া অ্যালিল থাকে? এবার সবাই বুঝতে পারল—

কোনো একটি নির্দিষ্ট জিনের দুটি কপি হোমোলোগাস ক্রোমোজোমগুলোর ঠিক একই বিন্দুতে থাকে।

এর মানে হলো যদি লম্বা-খাটো হওয়ার জন্য দায়ী জিনে দুইটার একটা এইখানে থাকে →

তাহলে তার আরেকটা কপি নিশ্চয়ই ← থাকবে এখানে

এসবের সবকিছুই সত্য প্রমাণিত হলো। কিন্তু মানুষ যখন আরও গভীরভাবে এ বিষয়গুলোর দিকে নজর দিল, তারা বুঝতে পারল এমন কিছু বিষয় রয়ে গেছে, যা মেন্ডেল বুঝতে পারেননি!

একটা ব্যাপার এখানে খেয়াল রাখা দরকার। সব জীবেরই কিন্তু ক্রোমোজোমের এক জোড়া সেট থাকে না। ব্যাঙের ছাতার মতো কিছু কিছু নীচু প্রজাতির জীবে কেবলমাত্র এক সেট মাত্র ক্রোমোজোম থাকে।

যেই কোষে ক্রোমোজোমের একটিমাত্র সেট থাকে, তাকে বলে **হ্যাপ্লয়েড** কোষ। আর যেই কোষে এক জোড়া সেট থাকে তাকে বলে **ডিপ্লয়েড** কোষ। আমাদের শরীরের কোষগুলো ডিপ্লয়েড কিন্তু জনন কোষগুলো হ্যাপ্লয়েড।

ডিপ্লয়েড জীবদের মধ্যে রয়েছে চেনা-জানা সব স্তন্যপায়ী, পাখি ও অধিকাংশ গাছপালা। হ্যাপ্লয়েডদের মধ্যে আছে পুরুষ মৌমাছি, অধিকাংশ ছত্রাক ও অযৌন এককোষী জীবেরা।

এসব ছাড়াও আরও একধরনের জীব আছে যারা **পলিপ্লয়েড**। এদের কোষে দুইয়ের চেয়েও বেশি সেট ক্রোমোজোম থাকে। দৈনন্দিন জীবনে আমরা যত ধরনের উদ্ভিদ ব্যবহার করি তাদের মধ্যে কতগুলো যে পলিপ্লয়েড সেই সংখ্যাটা অবাক করার মতো। (মেন্ডেলের ভাগ্য ভালো, মটরশুঁটি পলিপ্লয়েড না!)

মেন্ডেলের তত্ত্বের আরেকটা বড় ঝামেলা হলো স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হওয়ার নীতি। এটা কতটুকু ভুল ছিল সেটা সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করতে গিয়ে মানুষ বের করে ফেলল—জিনগুলো ক্রোমোজোমের ওপর ঠিক কোথায় কোথায় থাকতে পারে সেই মানচিত্র তৈরির উপায়।

মানচিত্র তৈরি

মেন্ডেল ও তার অনুসারীরা মনে করতেন জিন শুধু একটা ধারণা। এটা কোনো বস্তু না যেটা ধরা যাবে, ছোঁয়া যাবে কিংবা দেখা যাবে। তাদের কাছে জিন ছিল একটা শব্দ যেটা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় এবং অনুমান করা যায়—এক প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য কীভাবে পরের প্রজন্মে পরিবাহিত হয়।

এখন দেখা গেল জিন শুধু একটা ধারণাই না, এর ভৌত অস্তিত্বও আছে। প্রতিটা কোষের ক্রোমোজোমের ওপর জিনগুলো বেশ সুশৃঙ্খলভাবে বসানো থাকে। এবং... প্রতিটা জিনের দুইটা অ্যালিল হোমোলোগাস জোড়ার দুইটা ক্রোমোজোমের ওপর থাকে।

কেউ এটা ভেবে অবাক হতেই পারে—আসলেই কি একটা মানচিত্র বানানো সম্ভব যেটাতে দেখা যাবে বংশগতির এই ছোট ছোট কণা ক্রোমোজোমের ওপর ঠিক কোথায় কোথায় থাকে?

এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করছিল আপাতভাবে মনে হওয়া একটা স্ববিরোধিতার ওপর। যেমন একদিক থেকে চিন্তা করলে মনে হয়, পরীক্ষা করে ক্রোমোজোমের যে বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া গেছে তার সঙ্গে মেন্ডেলের একটা নীতি মেলে না।

যা দেখলাম: কোনো জটিল জীবের জৈবিক বৈশিষ্ট্যগুলো যারা নিয়ন্ত্রণ করে, সেই জিনদের সংখ্যা নিশ্চয়ই অনেক অনেক বেশি হবে। কিন্তু একটি কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা থাকে সেই তুলনায় খুবই অল্প। মটরশুঁটি গাছের কোষে থাকে মাত্র ৭ জোড়া ক্রোমোজোম, মানুষের ২৩ জোড়া।

যে ঝামেলায় পড়লাম: যদি একই ক্রোমোজোমে দুটি আলাদা জিন থাকে, তারা স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত **হবে কীভাবে??** ক্রোমোজোম তো আর ছিঁড়ে যায় না, তাই না? তাহলে তো আলাদা জিনগুলোর মধ্যেও কোনো সম্পর্ক থাকার কথা।

তাহলে প্রশ্ন থেকেই যায়—জিনগুলো কি আসলেই স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয় নাকি হয় না?

T.me/Porno_porichoy

আসলেইই ব্যাপারটা ঝামেলার। সত্যি কথা হলো, এটাও ঠিক, ওইটাও।

হ্যাঁ, কিছু কিছু জিনের মধ্যে সম্পর্ক আছে, ওইটা ঠিক।

কিন্তু

এটাও ঠিক যে ক্রোমোজোমগুলো প্রায়ই নিজেদের ভেতর জিন আদান-প্রদান করে! যাকে জিনতত্ত্বের ভাষায় বলে *crossing over*.

উদাহরণস্বরূপ বাগানের সাধারণ টমেটোর দিকে লক্ষ করা যাক।

...সবাইকে সতর্ক করা হইতেছে, ক্লাস শেষ হইবার আগেই যেন কেউ উদাহরণটিকে খাইয়া না ফেলে...

T.me/Borno_pothoy

টমেটোর বাইরের ত্বক কেমন হবে তার জন্য যেই জিনটি দায়ী, সেটির একটি প্রচ্ছন্ন অ্যালিল রয়েছে। এর কারণে কিছু টমেটোর বাইরের ত্বক রোমযুক্ত হয় (অবশ্যই বাজারে এগুলো খুব বেশি পাওয়া যায় না!) ধরা যাক অ্যালিলটির নাম *p*।

একইভাবে উচ্চতার জন্য দায়ী জিনটির একটা প্রচ্ছন্ন অ্যালিল আছে, যার কারণে গাছগুলো বেঁটে হয়। ধরা যাক, সেই অ্যালিলের নাম *d*।

এদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রকট অ্যালিলগুলো হলো *p*..., যার কারণে মসৃণ ফল হয় এবং *d*..., যার কারণে গাছগুলো লম্বা হয়।

স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হওয়ার সূত্র আসলেই মেনে চলে কি না, সেটা পরীক্ষা করার জন্য আমরা পুরোপুরি প্রচ্ছন্ন *ppdd*-এর সঙ্গে হেটারোজাইগোট pp^+dd^+কে ক্রস করাতে পারি।

রোমযুক্ত ফল, বেঁটে গাছ *ppdd*

মসৃণ ফল, লম্বা গাছ pp^+dd^+

আমরা ধরে নিচ্ছি, মেন্ডেল ঠিক ছিলেন— *p*গুলো *d*গুলোর ওপর নির্ভর না করে স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয়।

এদের সঙ্গে পুরোপুরি প্রচ্ছন্ন *ppdd*–এর ক্রস করলে পাশের ছকে দেখানো ফলাফলগুলো পাওয়ার কথা।

T.me/Borno_poricoy

এখন ধরা যাক, p আর d দুটি জিনই একই ক্রোমোজোমে রয়েছে। তাহলে pp^+dd^+ সংকরটির অ্যালিলগুলো একটি হোমোলোগাস জোড়ার ওপরে অবস্থিত।

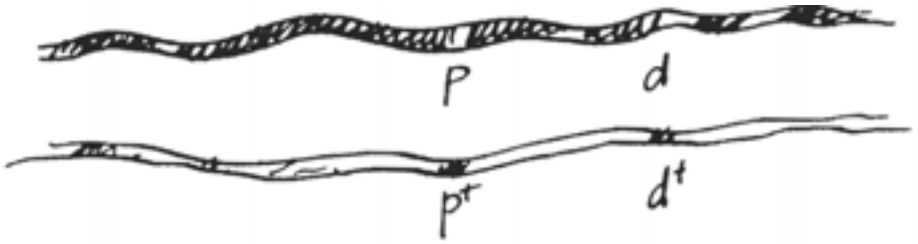

মিয়োসিসের সময় সেগুলো এভাবে বিন্যস্ত হয়:

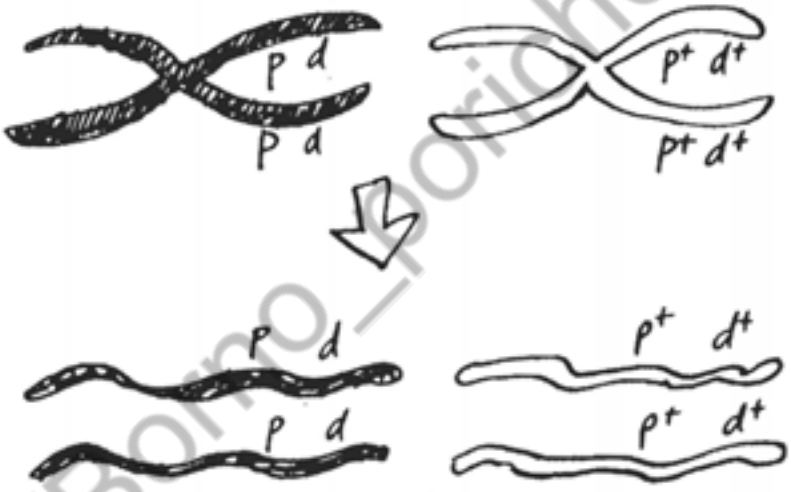

এ ক্ষেত্রে শুধু দুই ধরনের গ্যামেট তৈরি হওয়া সম্ভব: pd আর p^+d^+, যেখানে মেন্ডেল বলেছিলেন চার প্রকারের হবে।

১/২ মসৃণ, লম্বা
pp^+dd^+

এদের পুরোপুরি প্রচ্ছন্ন *ppdd*-এর সঙ্গে *cross* করে আমরা পাই:

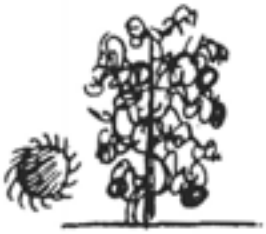

১/২ রোমযুক্ত, বেঁটে *ppdd*

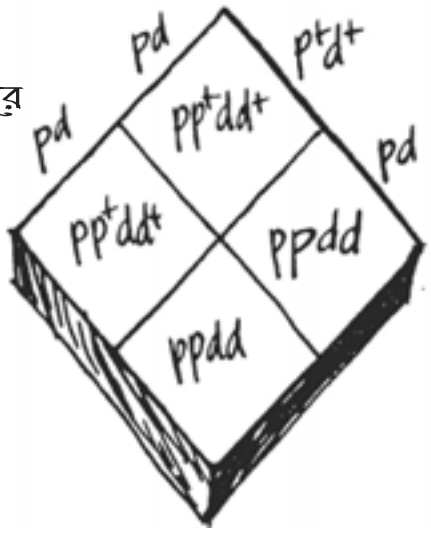

T.me/Boro_Boriohoy

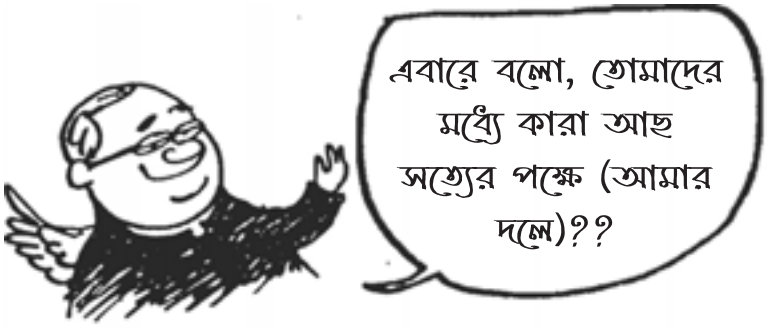

যখন সত্যি সত্যি ক্রস ঘটানো হলো তখন কী পাওয়া গেল? অর্ধেক অর্ধেক ভাগ নাকি সমান চার ভাগে ভাগ?

দেখা গেল কারও অনুমানই ঠিক হলো না। চার ধরনের গাছই যদিও পাওয়া গেল—কিন্তু এদের অনুপাতগুলো ছিল অদ্ভুত রকমের।

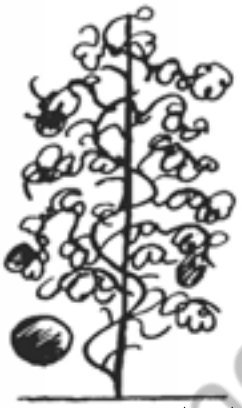
মসৃণ, লম্বা pp^+dd^+ ৪৮%

রোমযুক্ত, লম্বা $ppdd^+$ ২%

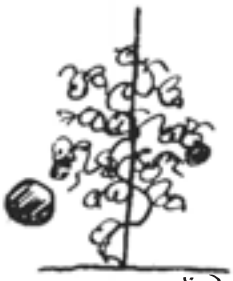
মসৃণ, বেঁটে pp^+dd ২%

রোমযুক্ত, বেঁটে $ppdd$ ৪৮%

নিঃসন্দেহে এই ফলাফল মেন্ডেলের অনুমানের চেয়ে জিনগুলো একই ক্রোমোজোমে থাকার তত্ত্বের সঙ্গেই বেশি মেলে। কিন্তু প্রশ্ন রয়েই যায়—p আর d যদি একই ক্রোমোজোমেই থাকে, তাহলে ২% করে ওই অদ্ভুত কম্বিনেশনগুলো কোত্থেকে এল?

T.me/Boi_pdf_shop

আর জমে না ঘোলা করে আসল কথাটা বলে ফেলি— *p* ও *d* জিনগুলো একই ক্রোমোজোমে থাকে, কিন্তু ক্রোমোজোমগুলো জিন আদান-প্রদান করতে পারে। একেই বলে ক্রসিং ওভার।

মিয়োসিসের সময় হোমোলোগাস ক্রোমোজোমগুলো এমনভাবে সারি বেঁধে দাঁড়ায় যেন একই জিনের অ্যালিলগুলো পাশাপাশি থাকে।

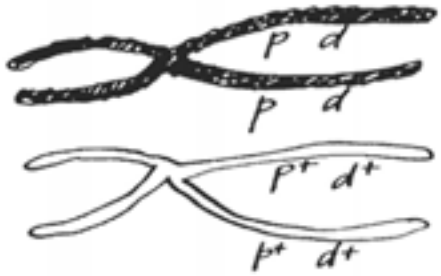

যেসব স্থানে তারা স্পর্শ করে, তার কিছু কিছু জায়গায় জিনের আদান-প্রদান ঘটে।

এই নতুন ক্রোমোজোমগুলোকে বলে রিকম্বিন্যান্ট ক্রোমোজোম (বাংলায় কী বলব— নববিন্যস্ত ক্রোমোজোম?)। আমাদের উদাহরণের হেটারোজাইগোট *pp+dd+* থেকেও এমনই কিছু গ্যামেট পাওয়া গিয়েছিল যার মধ্যে আসলে রিকম্বিন্যান্ট ক্রোমোজোম ছিল। এদের কারণেই ক্রসের সেই অদ্ভুত ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল।

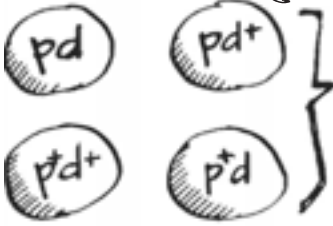

রিকম্বিন্যান্ট-এর দল

ক্রোমোজোমগুলো কিছু নির্দিষ্ট স্থানে পরস্পরকে স্পর্শ করে। তারা কোথায় স্পর্শ করবে সেটা তারা নিজেরাই ঠিক করে নেয়, আর কেউ বলতে পারে না!

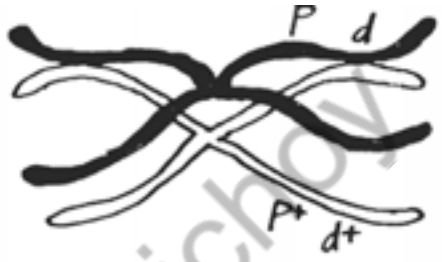

এরপর যখন তারা আলাদা হয়ে যায়, সেগুলোর ভেতর অ্যালিলের নতুন কম্বিনেশন দেখা যায়।

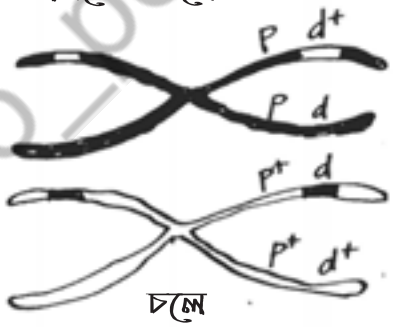

চলে

দ্রষ্টব্য: ভাগ্যিস ক্রসিং ওভার ছিল! নইলে সন্তানের চেহারা বা আচরণের এক একটা অংশ হয় শুধুই বাবার মতো নয়তো শুধুই মায়ের মতো হতো। তাস শাফল করলে যেমন ইচ্ছামতো মিশে যায়, মা-বাবার বৈশিষ্ট্যগুলোও তেমন ইচ্ছামতো মিশে গিয়ে সন্তানের ভেতর চলে যায়।

https://BanglaBook.org

যখনই ক্রসিং ওভার আবিষ্কৃত হলো, খুব দ্রুতই মানুষ বুঝতে পারল, ক্রোমোজোমের মানচিত্র বা নকশা তৈরির কাজে তারা অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

দুটি জিন যদি খুব কাছাকাছি অবস্থান করে, ক্রসিং ওভারের ফলে তারা খুব সহজে আলাদা হয় না। দূরত্ব যত বাড়ে সেগুলোর আলাদা হওয়ার হারও তত বেড়ে যায়। আর দূরত্ব যদি অনেক বেশি হয়, সে ক্ষেত্রে তারা পুরোপুরি স্বাধীনের মতো আচরণ করে।

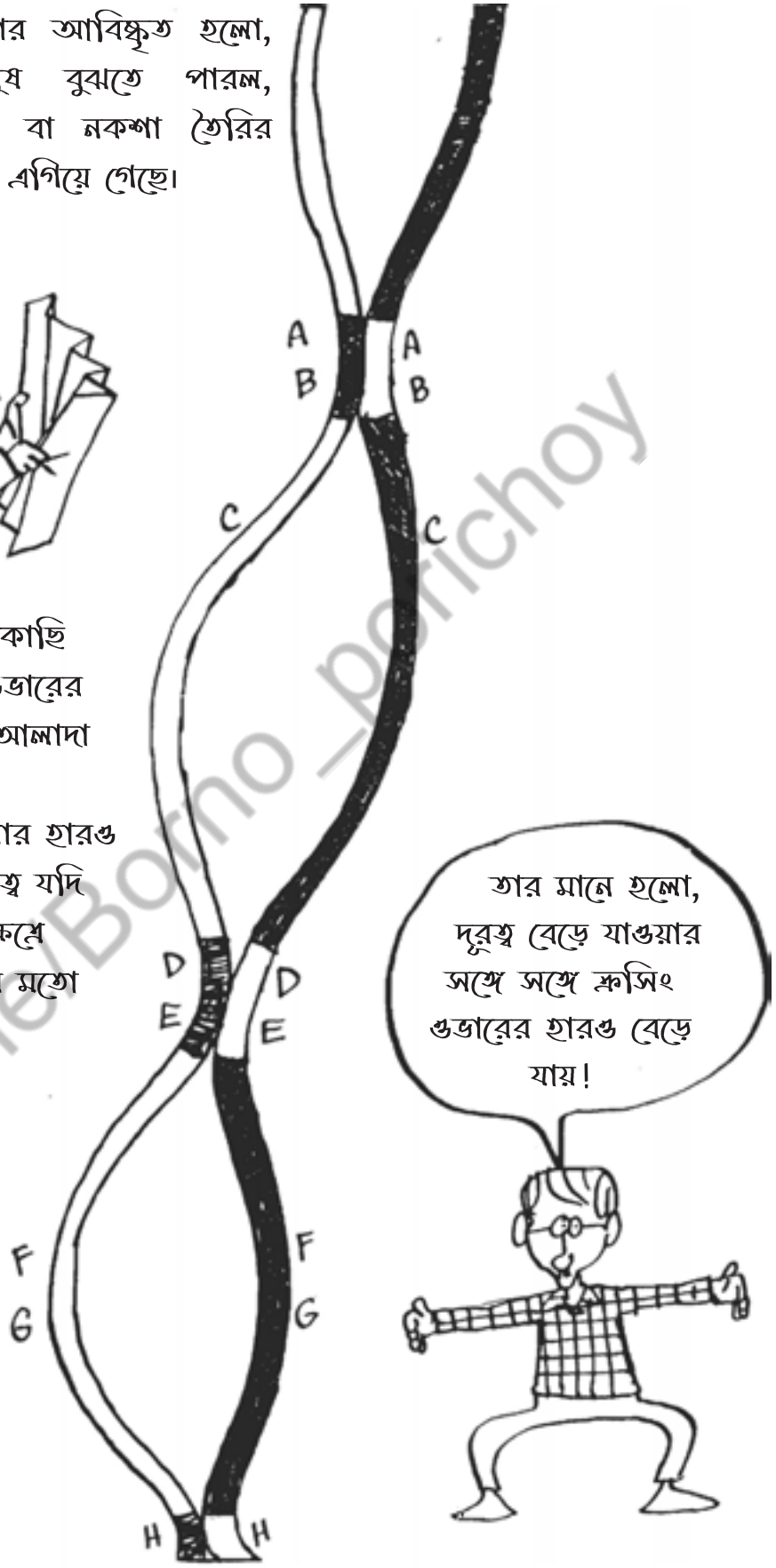

T.me/Borno_porichoy

তাহলে এবার বলা যাক—একটা জিনকেও কখনোই চোখে না দেখে কীভাবে জিনের নকশা বানিয়ে ফেলা যায়।

প্রথমে কোনো প্রজাতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অসংখ্য জোড়ার মধ্যে ক্রস ঘটানো হয়...

	A	B	C	D	E	F	G	H
A	0	.27	.03	.04	.33	.48	.19	.41
B	.27	0	.24	.31	.36	.45	.16	.44
C	.03	.24	0	.07	.30			
D	.04	.31	.07	0				
E	.33	.36	.30		0			
F	.48	.45				0		
G	.19	.16						
H	.41	.44						0

এরপর এদের পরবর্তী প্রজন্মে বৈশিষ্টগুলো কীভাবে অর্থাৎ কী অনুপাতে ছড়িয়েছে সেটা পর্যবেক্ষণ করে বুঝে ফেলা যায়—ক্রসিং ওভারের ফলে জোড়াগুলো কী হারে আলাদা হয়ে যায়।

এর পরের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজটা সোজা। যেসব বৈশিষ্ট্য যত দ্রুত হারে আলাদা হয়ে যায়, সেসব বৈশিষ্ট্যের জিন তত দূরে দূরে অবস্থিত। উল্টো করে বললে, যাদের সম্পর্ক যত কাছের তারা থাকেও তত কাছাকাছি।

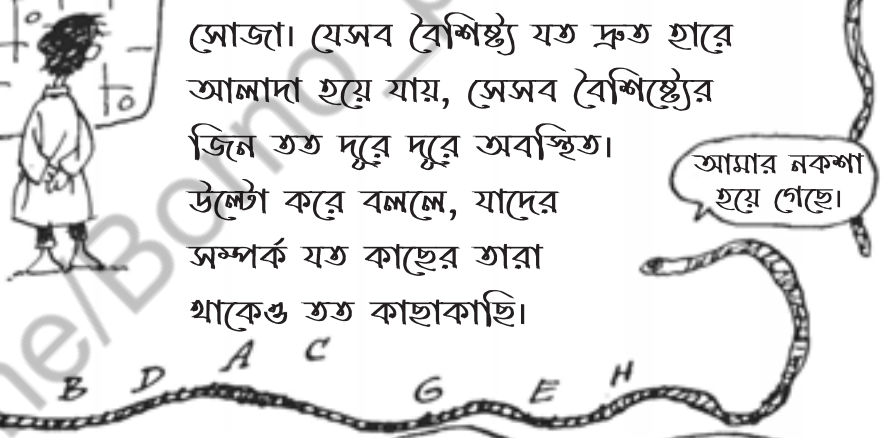

১৯১৩ সাল থেকে নানান প্রজাতির বিভিন্ন জিনের নকশা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এরই মাঝে নানান রকম ব্যাকটেরিয়া, আলু, ধান, কুকুর, বিড়াল, ইঁদুরসহ অনেক জীবের জিন নকশা শেষ হয়েছে। ২০০৩ সালে 'হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট' অর্থাৎ মানুষের জিন নকশাও সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

পরিব্যক্তি (MUTATION)

জিন যেভাবে বদলে যায়

এখন পর্যন্ত আমরা ভেবেছি জিন হলো 'বংশগতির অণু' যা কখনো সামান্যও পরিবর্তিত হয় না। সে অক্ষয়, অমর। শত ঝড় ঝাপটাতেও বংশগতির এই ধারক-বাহকের কিছুই হয় না!

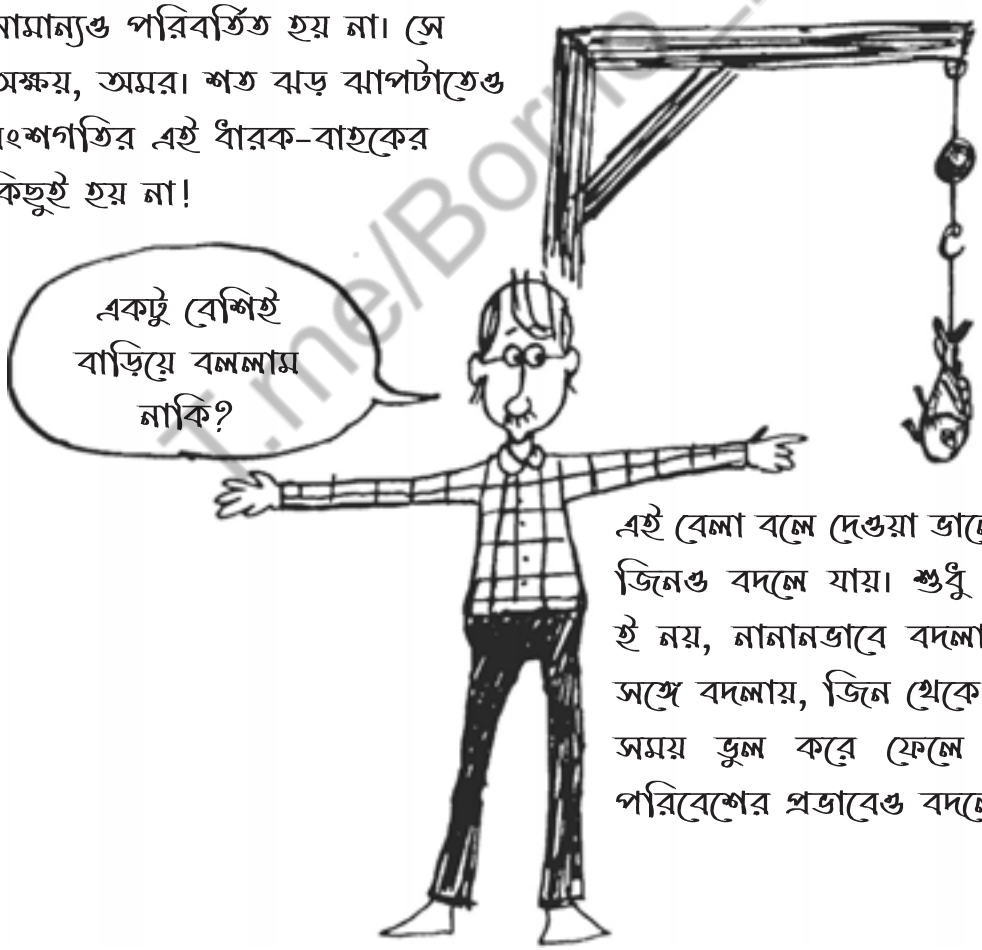

এই বেলা বলে দেওয়া ভালো—সত্যিটা হলো জিনও বদলে যায়। শুধু যে বদলায় তাই-ই নয়, নানানভাবে বদলায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলায়, জিন থেকে তথ্য কপি করার সময় ভুল করে ফেলে বদলায়—এমনকি পরিবেশের প্রভাবেও বদলেও যায়।

তবে এই মিউটেশন— লাতিন ভাষায় যার অর্থ 'পরিবর্তন'—খুবই বিরল ঘটনা।

কোনো নির্দিষ্ট প্রজাতির জীবের কোনো নির্দিষ্ট জিনে মিউটেশন খুঁজে পাওয়ার সম্ভাব্যতা:

→ **১ লাখে ১টা**

সম্ভাব্যতার মান যত ছোটই হোক, এরা যোগের সূত্র মেনে চলে। আর একজন মানুষের দেহের কোষে প্রায় ২ লাখ জিন থাকে। তাই আমরা প্রত্যেকেই আমাদের শরীরে গড়ে দুটি করে জিন বহন করি, যেখানে মিউটেশন ঘটেছে।

জিনের একটা সামান্য মিউটেশনের ফলে জীবের আকার-আকৃতিতে বিরাট পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু স্বস্তির ব্যাপার হলো- অধিকাংশ মিউটেশনই খুব দুর্বল আর অস্থায়ী ধরনের হয়। এটা না হলে আমরা সবাই এত দিনে দেখতে দানবের মতো হয়ে যেতাম।

মাঝে মাঝে মিউটেশন কেবল নতুন কোনো প্রচ্ছন্ন অ্যালিলের জন্ম দেয়। যেমন টমেটোর বাইরের ত্বক রোমযুক্ত হওয়ার ব্যাপারটা। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো জীবের একই প্রজাতির একটি জোড়া, যাদের মধ্যে একই মিউটেশন ঘটেছে, তারা মিলিত হয়ে কোনো নতুন হোমোজাইগোট উৎপন্ন না করেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ওই প্রচ্ছন্ন অ্যালিলটির উপস্থিত ধরাই পড়বে না।

মাঝে মাঝে মিউটেশন ঘটলেও কোনো পরিবর্তনই হয় না। আবার মাঝে মাঝে পরিবর্তনটাই এতই অল্প হয়, খালি চোখে বোঝাই যায় না।

কিন্তু যার শরীরের জিনে মিউটেশনটি ঘটেছে, সেই মিউট্যান্ট জীবের জন্যে জিনের ত্রুটিটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাপে-বর হয়ে দেখা দিতে পারে!! ভালো কিছুই বয়ে আনতে পারে তার জন্যে।

T.me/BanglaBook.org

মিউটেশন যে সব সময় নিজের থেকে, ইচ্ছেমতন হয় তা কিন্তু না! তা ছাড়া...বাইরের যেকোনো কিছুর প্রভাবেই মিউটেশনের স্বাভাবিক হার বেড়ে যেতে পারে। যেসবের উপস্থিতিতে মিউটেশন বেড়ে যায়, তাদের বলে মিউটাজেন (*Mutagen*)।

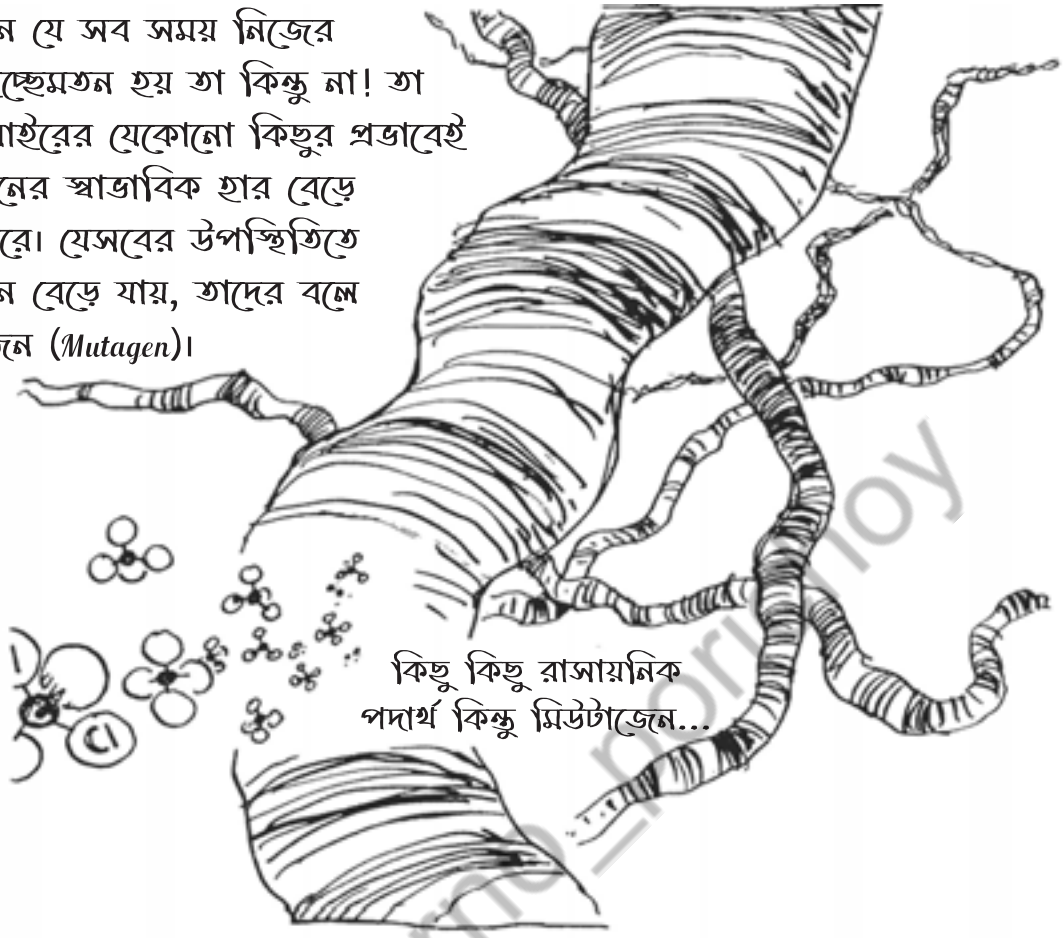

তেমনভাবে তেজস্ক্রিয়তার কারণে সবচেয়ে বেশি মিউটেশন ঘটতে পারে। হারমান মুলার প্রথমবারের মতো এ ব্যাপারটি মানুষের সামনে তুলে ধরেন। তিনি ফলের মাছির শরীরে (এই প্রাণী জিন গবেষকদের খুব প্রিয়) এক্স-রে প্রয়োগ করে দেখান তেজস্ক্রিয়তা মিউটেশন ঘটানোয় কী প্রচণ্ড ভূমিকা রাখতে পারে!

শরীরের কোষে (জননকোষে নয়, দেহকোষে) মিউটেশন ঘটলে ক্যানসার রোগ দেখা দিতে পারে। এটাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই—জিনগুলোই তো কোষের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। কোষ কীভাবে বিভাজিত হবে—সেটাও জিনই নিয়ন্ত্রণ করে। ক্যানসার ঠিক কীভাবে হয় সেটা নিয়ে এখনো অনেক রহস্য রয়ে গেছে। তবে এটুকু নিশ্চিত করেই বলা যায় যে সেখানে মিউটেশনের ভূমিকা আছে। কোষের বিভাজন নিয়ন্ত্রণ করে যে জিনটি সেটাতে কোনো বিশেষ মিউটেশন ঘটলে কোষগুলো তখন অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিভাজিত হতেই থাকে—একেই আমরা বলি ক্যানসার।

মিউটেশন ঘটায় এমন অনেক বস্তুই আছে যারা কারসিনোজেনিক (*Carcinogenic*–ক্যানসার সৃষ্টিকারী)। এ জন্যই খাবার কিংবা ওষুধ কেনার সময় লক্ষ রাখতে হয়—এর মধ্যে এমন কিছু দেওয়া আছে কি না, যা মিউটেশন ঘটায়। আর এ জন্যই সাদা চামড়ার লোকদের বেশি বেশি রৌদ্রস্নান করা ঠিক না! (অতিবেগুনি রশ্মি মিউটেশন ঘটাতে পারে!)

লিঙ্গ নির্ধারিত হয় কী দিয়ে?

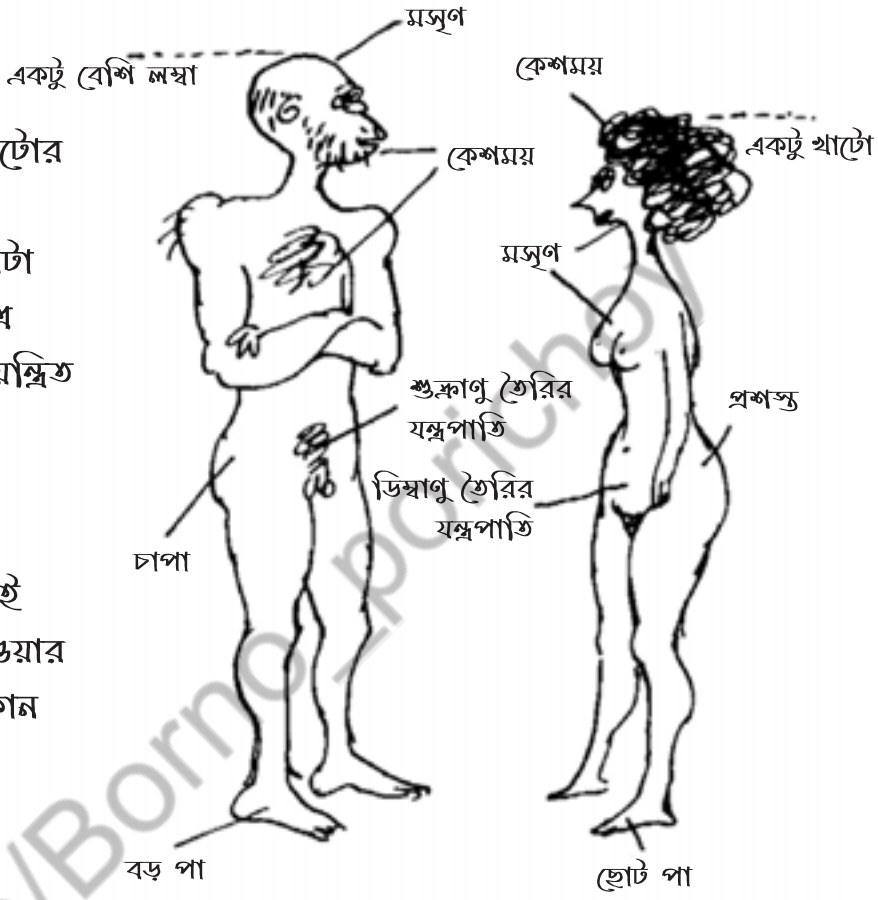

মটরশুঁটির ফুলের রং টমেটোর চেহারা, মটরের খোসার কোঁচকানো হওয়ার ব্যাপারটা এমন প্রতিটি বৈশিষ্ট্যই মাত্র একটা করে জিন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু সবচেয়ে **স্পষ্ট**, সবচেয়ে **আকর্ষণীয়** এবং (মানুষের ক্ষেত্রে) সবচেয়ে **গুরুত্বপূর্ণ** যে বৈশিষ্ট্য—সেই **নারী ও পুরুষ** আলাদা হওয়ার ব্যাপারটি নির্ধারণ করে কোন বস্তুটি?

ইতিহাস থেকে জানা যায়, যুগে যুগে বহু চিন্তাবিদ এ বিষয়টি নিয়ে ভেবেছেন এবং নানান রকম তত্ত্ব দিয়েছেন। আঠারো শতকে এ নিয়ে এক লেখক তো '২৬২টি ভিত্তিহীন তত্ত্ব' (262 GROUNDLESS HYPOTHESIS) নামে একটি সংকলনই বের করে ফেললেন। সেই হিসাবে তিনি নিজে যে ভুয়া তত্ত্বটি দিলেন, সেটা হয়ে দাঁড়াল ২৬৩তম।

T.me/Borno_porichoy

কিন্তু অবশ্যই সেটা জিনের ভেতরে...। হোমোলোগাস ক্রোমোজোম আবিষ্কারের বেশিদিন পরের কথা না...

মানুষ এ বিষয়টার একটা ব্যতিক্রম লক্ষ করল। দেখা গেল পুরুষ মানুষের শরীরের কোষে এক জোড়া ক্রোমোজোম আছে, যারা হোমোলোগাস নয়!!

এই ক্রোমোজোম জোড়ার বড়টির নাম দেওয়া হলো X, ছোটটিকে বলা হলো Y.

পুরুষ ও নারীর মধ্যে দেখা গেল জিনগত পার্থক্য শুধু একটাই

T.me/porno_porichoy

সঠিক অনুপাতে ছেলে বাচ্চা আর মেয়ে বাচ্চা জন্মেছে কি না, সেটা নিশ্চিত হওয়া যাক!

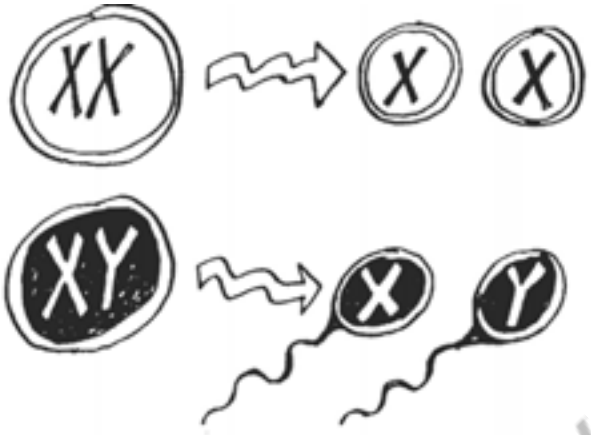

মিয়োসিসের ফলে যে ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়, তার ভেতরে থাকে শুধুই X ক্রোমোজোম। শুক্রাণুগুলোর অর্ধেকের ভেতরে থাকে X, বাকি অর্ধেকে Y।

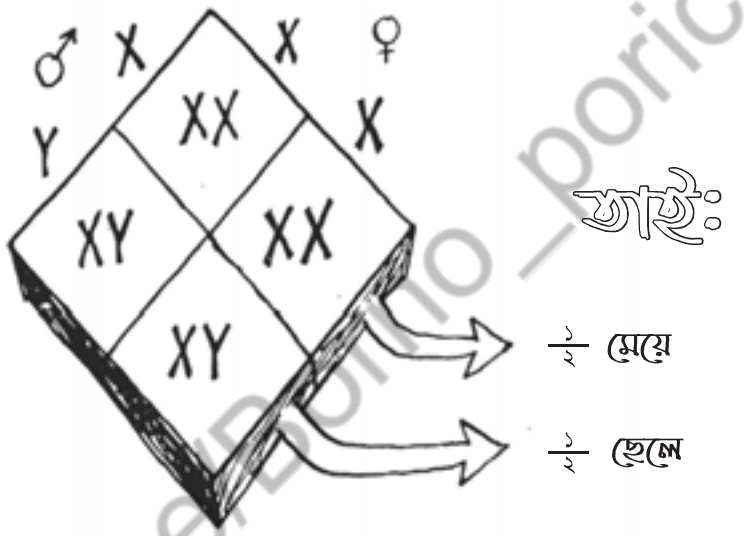

T.me/Boi_porichoy

তারপরও জিনগতভাবে চিন্তা করলে মূল ঝামেলাটা থেকেই যায়—কোন জিনের কারণে কী হয়? *Y* ক্রোমোজোম থাকলেই কি পুরুষ হয়?
নাকি দুইটা *X* একসঙ্গে থাকলেই নারী হয়?
যদি কারও শরীরে দুইটা *X* আর একটা *Y* থাকে, তাহলে কী হবে?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া গেল মিয়োসিসের ব্যর্থ ক্ষেত্রগুলো পর্যবেক্ষণ করে। মাঝে মাঝে শুক্রাণু তৈরির সময় ঝামেলা হয়ে যায়।

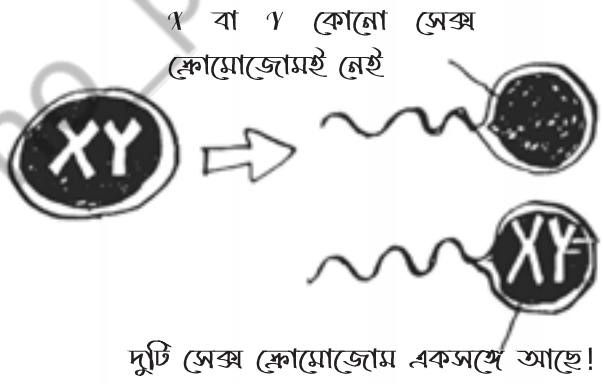

তখন:

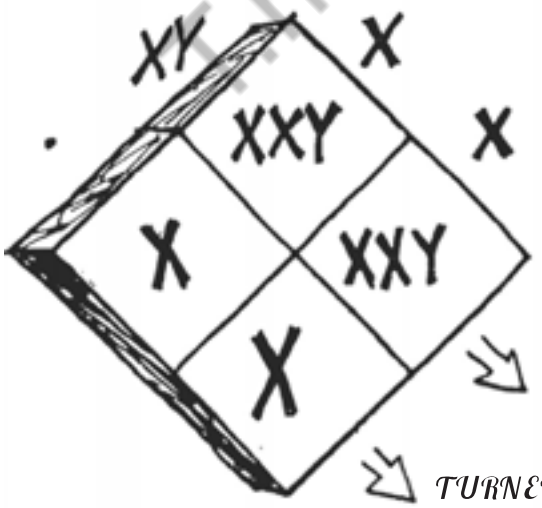

দেখা গেল *XXY* বেড়ে উঠল পুরুষ হিসেবে। একে বলে *KLEINFELTER'S SYNDROME*। তার মানে দুইটা *X* থাকা সত্ত্বেও এটি শেষ পর্যন্ত পুরুষই হলো। আর দেখা গেল, একটি *X* ওয়ালা শিশুটি হলো নারী।

KLEINFELTER'S SYNDROME

TURNER'S SYNDROME

t.me/Borno_porichoy

আরেকটা অস্বাভাবিক ব্যাপার হলো অতি পুরুষ সমস্যা XYY। এ ধরনের ঘটনা ঘটে হাজারে একটা। এ ধরনের শিশুরা সাধারণ পুরুষ হিসেবেই বেড়ে ওঠে। তবে মজার কথা হলো, এ ধরনের মানুষ বাকি সব সাধারণ মানুষের তুলনায় ২০ গুণ বেশি অপরাধী হয় এবং জেলে জীবন কাটায়। জেলের মধ্যে যেসব বন্দী থাকে, দেখা গেছে, তাদের শতকরা ৫ ভাগের শরীরেই একটা অতিরিক্ত Y ক্রোমোজোম থাকে।

* ক্যারিওটাইপ— কোনো জীবের ক্রোমোজোমের বিন্যাস।

অবশ্য অধিকাংশ জিন গবেষক আরও সতর্ক হয়ে কথা বলবেন—তারা বলবেন, XYY পুরুষদের একটা বিশাল অংশ (৯৫ শতাংশের চেয়েও বেশি) কিন্তু কারাগারে জীবন কাটায় না! সুতরাং XYY থাকলেই সে অপরাধী হবে, XYY হলো অপরাধী ক্যারিওটাইপ—এভাবে ধুম করে কিছু বলে ফেলাটা কখনোই উচিত না।

T.me/Borno_Porichoy

না, সব সময় না। নারী-পুরুষ আলাদা করার অনেক রকম উপায় আছে। তবে প্রচুর জীব আছে যাদের এ ব্যাপারটা মানুষের মতোই!

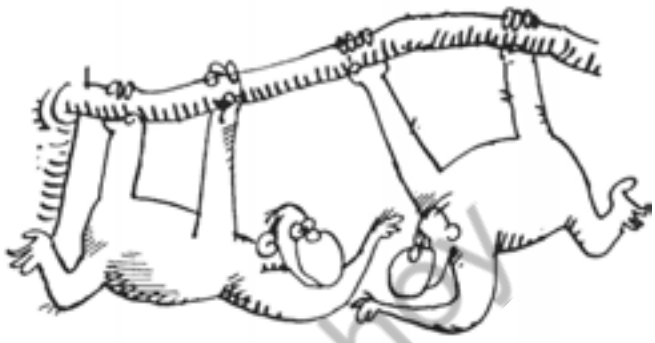

আবার পাখিদের ক্ষেত্রে ঘটনাটা পুরোই উল্টো!

আর মৌমাছির বেলায় তো ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত। পুরুষ মৌমাছির জন্ম হয় অনিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে। তারা সবাই হ্যাপ্লয়েড। অন্যদিকে স্ত্রী মৌমাছিগুলো সবাই ডিপ্লয়েড (মৌচাকে এদের সংখ্যাই বেশি থাকে। এ ব্যাপারটা বাদ দিলে মৌমাছির দেহে আর কোনো সেক্স ক্রোমোজোম আসলে থাকে না!

T.me/Borno_Porichoy

আরও বেশি অদ্ভুত ব্যাপারও রয়েছে। এমনও দেখা গেছে, নারী-পুরুষ আলাদা জীব অথচ জিনতাত্ত্বিকভাবে এদের ভেতর একেবারেই কোনো পার্থক্য নেই। সামুদ্রিক কীট বোনেলিয়ার (*BONELLIA*) কথাই ধরা যাক। এদের লার্ভা যখন সমুদ্র তলদেশে সরাসরি গিয়ে পড়ে, এরা তখন এক মিটারের মতো লম্বা নারী কীট হিসেবে বেড়ে ওঠে।

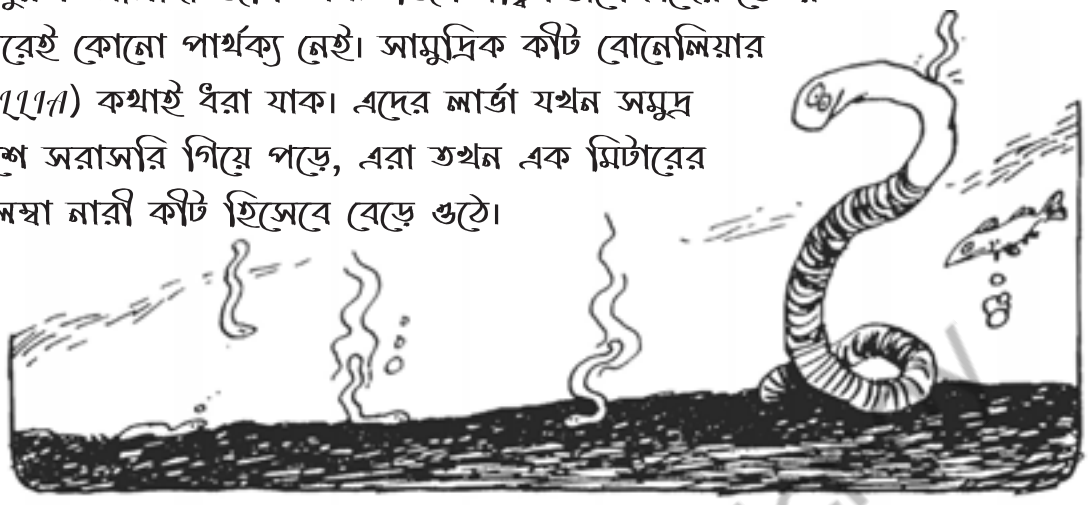

কিন্তু এই লার্ভা যদি কোনো নারী কীটের শরীরে গিয়ে পড়ে, তখন সেটি ওই কীটের শরীর ফুটো করে ভেতরে ঢুকে যায়...

সে ক্ষেত্রে ভেতরে ঢুকে এটি মাত্র এক সেন্টিমিটার লম্বা একটি পুরুষ কীটে পরিণত হয় এবং তার জীবনের পুরোটা অংশ ওই নারী কীটের শরীরের ভেতরেই কাটিয়ে দেয়।

আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই লিঙ্গবৈষম্য তো একেবারেই তুচ্ছ! কিছু কিছু এককোষী প্রোটোজোয়া আছে, যাদের পুরুষ-নারী দুটি রকম আছে ঠিকই, কিন্তু পার্থক্যটা একটামাত্র জিনে। এদের জন্য অপর লিঙ্গের কাউকে চিনে খুঁজে বের করা অসম্ভব কঠিন। ওরা সেটা করেও না, অযৌন উপায়েই বংশ বৃদ্ধি করে।

T.me/BanglaBook.org

X-RATED জিন

আবার ফিরে যাওয়া যাক মানুষের কাছে। আমরা দেখেছি যেসব বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি যৌনতার সঙ্গে সম্পর্কিত সেগুলোর জিন শুধু দুটি ক্রোমোজোমের ওপর থাকে, মেয়েদের ক্ষেত্রে X আর ছেলেদের ক্ষেত্রে Y-এর ওপর।

এখন, আমরা তো চাইলেই নিচের প্রশ্নটি করতেই পারি—

প্রশ্ন:

সেক্স ক্রোমোজোমে আর অন্য কোনো জিন কি থাকে?

এই প্রশ্ন করার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। প্রায়ই মানুষের শরীরে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য কিংবা ত্রুটি দেখা যায়, যার সঙ্গে পুরুষ-নারী ব্যাপারটার লক্ষণীয় যোগাযোগ আছে।

অধিকাংশ টাক মানুষ হয় পুরুষ।

বর্ণান্ধ মানুষের অধিকাংশই পুরুষ।

একইভাবে হিমোফিলিয়া আক্রান্ত মানুষদের বেশির ভাগই হয় পুরুষ।

* হিমোফিলিয়া—এ সমস্যাটা থাকলেও রক্ত জমাট বাঁধে না, ফলে কোথাও সামান্য কেটে গেলে রক্তক্ষরণের ফলে তার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

T.me/Borno_porichoy

এ থেকে কেউ হয়তো ভাবতে পারে যে এই জিনগুলো মনে হয় Y ক্রোমোজোমে রয়েছে। কিন্তু এ ধারণাটা ঠিক নয়। আসলে, হিমোফিলিয়া, বর্ণান্ধতা কিংবা বংশানুক্রমে টাক হওয়ার ব্যাপারটা, এ সবকিছুই ঘটে প্রচ্ছন্ন অ্যালিলের কারণে, যেগুলো আসলে থাকে X ক্রোমোজোমে।

সাধারণত মহিলারা টাক হয় না। এর কারণ হলো—যদিও বা তাদের একটা X ক্রোমোজোমে টাক হওয়ার বৈশিষ্ট্য থাকে, অন্য X ক্রোমোজোমটিতে টাক না হওয়ার বৈশিষ্ট্য থাকে। টাক না হওয়ার অ্যালিলটিই এ ক্ষেত্রে প্রকট বৈশিষ্ট্য বলে মহিলারা টাক হয় না।

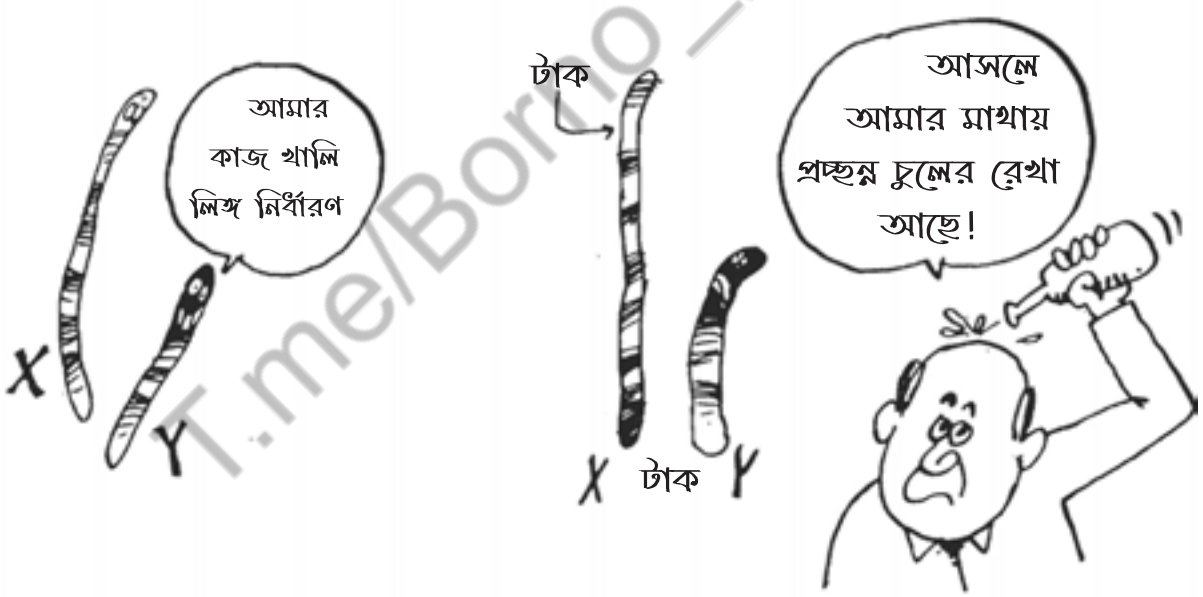

T.me/Borno_porichoy

কিন্তু পুরুষদের বেলায় বৈশিষ্ট্যটি দেখা যায়। কারণ পুরুষের Y ক্রোমোজোমে টাকসংক্রান্ত কোনো জিনই থাকে না, যা টাক হওয়া প্রতিরোধ করবে। আর প্রকট অ্যালিল না থাকলে প্রচ্ছন্ন অ্যালিলের বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পাবে, এটাই স্বাভাবিক।

এবারে দেখা যাক কীভাবে সেক্স ক্রোমোজোমে থাকা জিনগুলো অর্থাৎ সেক্স–লিঙ্কড জিনগুলো বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয়–

ধরা যাক, একজন স্বাভাবিক মহিলার (XX) সঙ্গে একজন টাক ($X_{\text{টাক}}Y$) লোকের বিয়ে হলো ও তাদের সন্তান জন্ম নিল। এখানে মহিলা স্বাভাবিক হওয়া বলতে বোঝাচ্ছি তার মধ্যে টাকের অ্যালিল $X_{\text{টাক}}$ নেই।

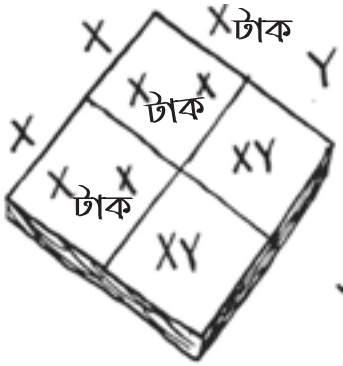

এতে, সব কন্যাসন্তান হবে বাহক ($X_{\text{টাক}}X$), তবে তারা নিজেরা টাক হবে না, শুধু টাকের প্রচ্ছন্ন অ্যালিল বয়ে বেড়াবে। পুত্রসন্তানগুলো হবে সবাই স্বাভাবিক।

মা যদি স্বাভাবিক হয় (XX), ছেলেসন্তান বা মেয়েসন্তান কেউই টাক হবে না, এটা নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যায়।

T.me/Borno_porichoy

পরবর্তী প্রজন্ম: ধরা যাক, ওই বাহক মেয়েগুলোর কেউ কোনো স্বাভাবিক পুরুষকে বিয়ে করল।

এবার গড়ে অর্ধেক মেয়েসন্তান হবে বাহক আর অর্ধেক ছেলেসন্তান হবে টাক!

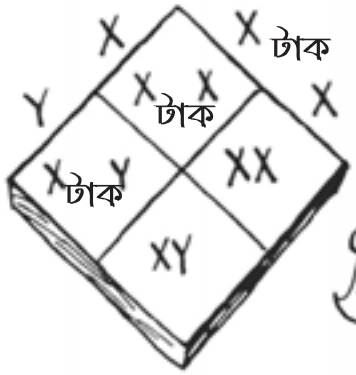

এর মানে হলো, কারও নানা যদি টাক হয়, তার টাক হওয়ার আশঙ্কা আছে।

হিমোফিলিয়াও একই নীতি অনুসরণ করে। এর জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ হতে পারেন ইংল্যান্ডের রানি ভিক্টোরিয়া। তিনি ছিলেন হিমোফিলিয়ার একজন বাহক।

রানি ভিক্টোরিয়ার পূর্বপুরুষদের মধ্যে হিমোফিলিয়ার কোনো নজির পাওয়া যায় না। তার মানে ধরে নিতে পারি, তার মধ্যে এই ত্রুটি এসেছিল কোনো স্বতঃস্ফূর্ত মিউটেশন ঘটার ফলে। হিমোফিলিয়ার এ ব্যাপারটি প্রতি ৫০ হাজার পরিবারের মধ্যে একটিতে ঘটে—এমনটিই অনুমান করা হয়।

AmarBorno_porichoy

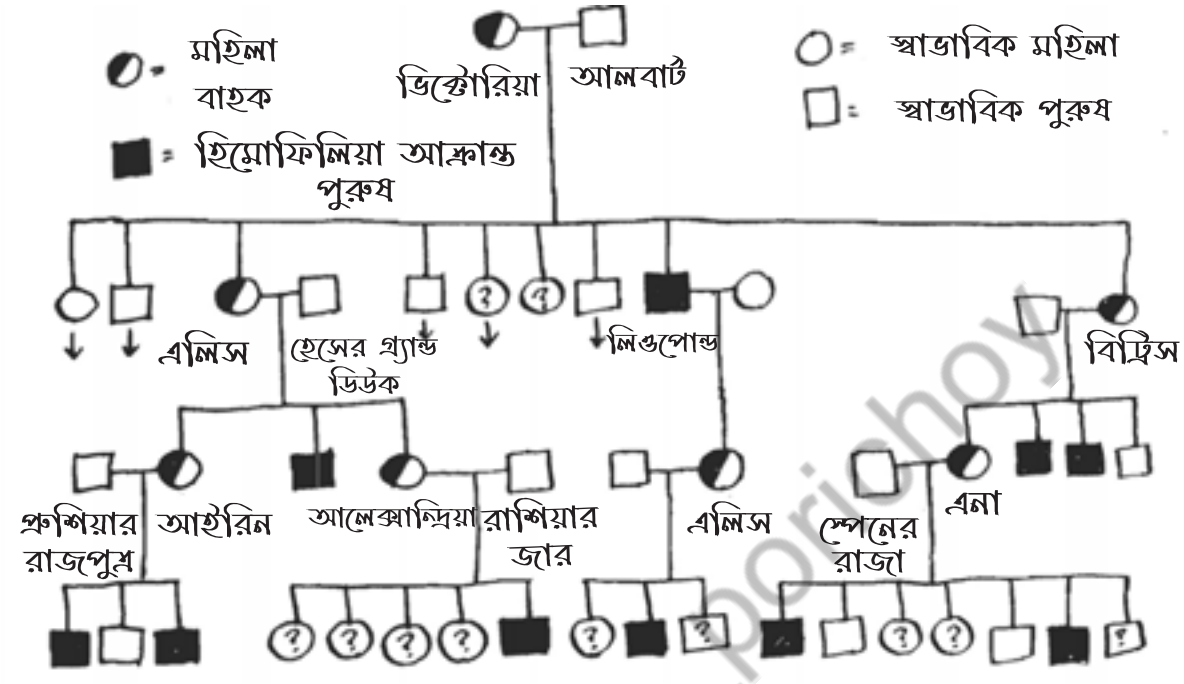

টাক হওয়ার ঘটনার মতোই হিমোফিলিয়া বংশপরম্পরায় পরিবাহিত হয়। রানি ভিক্টোরিয়ার বংশপরম্পরার দিকে নজর দিলেই ব্যাপারটা দেখা যাবে—

ভিক্টোরিয়ার অসংখ্য সন্তানসন্ততির বিয়ে হলো ইউরোপের বিভিন্ন রাজপরিবারে। তাদের মাধ্যমে হিমোফিলিয়ার সমস্যাটা ছড়িয়ে পড়ল প্রুশিয়া, স্পেন এবং বিপ্লবপূর্ণ রাশিয়ার জনগণের মধ্যে।

T.me/Bono_porichoy

যাহোক, একবার ভেবে নিই উনিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বিজ্ঞান কতটা এগোতে পারল। মেন্ডেল ও তার উত্তরসূরিরা পুরোনো দিনের দ্বিধা...সংশয়গুলো মোটামুটিভাবে মুছে ফেলেছেন। মানুষ জানে, বাবার ভূমিকা কী, মায়ের ভূমিকা কী, সংকর ও 'স্পোর্ট'-এর প্রকৃতি কেমন, লিঙ্গ কীভাবে নির্ধারিত হয়—জীবের বিভিন্ন রকম বৈশিষ্ট্য দেখানোর পেছনে কে দায়ী, সেটাও মানুষ বুঝে ফেলেছে।

এই সবকিছুই ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'জিন' শব্দটি দিয়ে। জিন কোথায় থাকে, জিনের নকশা কেমন কিংবা জিন কীভাবে বংশানুক্রমে বৈশিষ্ট্যগুলো বয়ে নিয়ে যায়—সবই তো জানা গেল... তবু একটা প্রশ্ন কিন্তু রয়েই গেল—

না... প্রশ্নটি হলো—জিন আসলে কী আর কীভাবেই বা সে কাজ করে?

সহায়ক বইগুলো:

STUBBE, H., ***HISTORY OF GENETICS FROM PRE-HISTORIC TIMES TO THE REDISCOVERY OF MENDEL'S LAWS,*** M.I.T. PRESS, 1972. HARD TO FIND, BUT A FINE SCHOLARLY HISTORY OF GENETICS TO 1900.

DUNN, L.C., ***A SHORT HISTORY OF GENETICS,*** McGRAW-HILL, 1965. MORE PRE-1939 GENETICS. GOOD PIX.

JUDSON, H.F., ***THE EIGHTH DAY OF CREATION,*** SIMON & SCHUSTER, 1979. READABLE HISTORY OF MOLECULAR BIOLOGY.

WATSON, J.D., ***THE DOUBLE HELIX,*** ATHANEUM, 1968. ONE OF THE DISCOVERERS OF DNA'S STRUCTURE TELLS HIS STORY. FLIPPANT AND SEXIST, BUT FASCINATING.

SAYRE, A., ***ROSALIND FRANKLIN AND DNA,*** NORTON, 1978. AN ANTIDOTE TO WATSON'S BIAS.

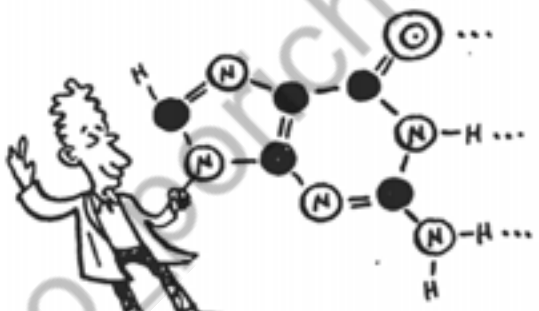

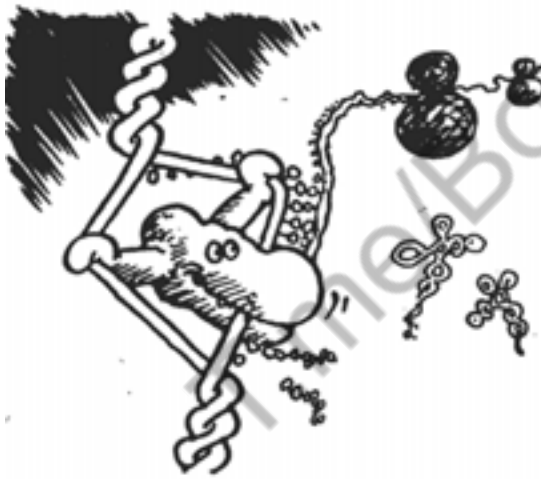

CURTIS, H., ***BIOLOGY, 2ND EDITION,*** WORTH, 1975. A GOOD GENERAL BIO TEXT, FOR MORE ON MOLECULES AND CELLS.

AYALA, F.J., + KEIGER, J.A., ***MODERN GENETICS,*** BENJAMIN CUMMINGS, 1980. ONE OF MANY UP-TO-DATE TEXTS.

STENT, G. + CALENDAR, R. ***MOLECULAR GENETICS, 2ND EDITION,*** FREEMAN, 1978. ALL THE DETAILS. (THE FIRST EDITION, BY STENT ALONE, IS A CLASSIC, THOUGH DATED.)

WATSON, J.D., ***MOLECULAR BIOLOGY OF THE GENE, 3RD EDITION,*** W.A. BENJAMIN, 1976. MORE DETAILS.

CAVALIERI, L.F., ***THE DOUBLE-EDGED HELIX,*** COLUMBIA U. PRESS, 1981; SUBTITLED "SCIENCE IN THE REAL WORLD".

CHARGAFF, E., ***HERACLITEAN FIRE,*** ROCKEFELLER U. PRESS, 1978. A CRANKY MEMOIR, BUT MAYBE WE SHOULD LISTEN TO HIM!

WADE, N., ***THE ULTIMATE EXPERIMENT: MAN-MADE EVOLUTION,*** WALKER & CO, 1977. RECOMBINANT DNA BY ONE OF OUR BEST SCIENCE WRITERS.